চলচ্চিত্রে এক্সট্রা অভিনেত্রী : ফ্ল্যাশব্যাক ও এই সময়

জয়শ্রী সরকার

শুরুর কথা

এই ভূখণ্ড বহুজাতি অধ্যুষিত। ফলে এখানকার দেশজ সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের নিদর্শন প্রাপ্তি ঘটে নানারকম শিল্পমাধ্যমকে আশ্রয় করে। সময়ের চোরাস্রোতে আজ অনেক শিল্পমাধ্যম লুপ্ত, তবু গণমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র টিকে আছে আপন মহিমায়। এই চলচ্চিত্র মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে সুখ-দুঃখ-স্বপ্নে। এই আচ্ছন্ন করে রাখার কর্মটি সম্পাদিত হয় অভিনয়শিল্পীদের মাধ্যম করে, যেখানে নানা পর্যায়ের অভিনয়শিল্পীর উপস্থিতি বিদ্যমান। চলচ্চিত্রের পর্দায় উপস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা মিলে বিপুল সংখ্যক সহকারী অভিনয়শিল্পীর, যারা চলিত ভাষায় কখনো 'এক্সট্রা', কখনো 'জুনিয়র শিল্পী' কখনো-বা 'ব্যাকগ্রাউন্ড শিল্পী' হিসেবে পরিচিত।

শিল্পের প্রয়োজনে তাদের উপস্থিতি অপরিহার্য হলেও চলচ্চিত্র শিল্পের প্রান্তিকতায় তাদের বাস। স্ব স্ব মহিমায় কদাচিৎ দর্শকের নজর কাড়েন, নতুবা বসে থাকেন হেথায়-সেথায়। পেশাগত চুক্তির অভাব, নগণ্য মজুরি, মজুরি প্রদানে অনিয়ম, খাদ্যসহ যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈষম্য, পারিবারিক ভাঙন, পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র কর্তৃক অসম্মান, মানসিক-শারীরিক এবং যৌন নির্যাতনসহ নানাবিধ নিপীড়ন তাদের নিত্যসঙ্গী।

সুপ্রাচীন সামন্ত মূল্যবোধের সমাজে অভিনয় ক্ষেত্রে নারীর আগমনের ইতিহাস সব দিক থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। চিরকালই নারীর অন্তঃপুর থেকে বাইরে আগমন, রঙ্গালয় থেকে রুপালি পর্দায় পদার্পণ, টিকে থাকার লড়াইও পুরুষের চেয়ে ভিন্ন। নিপীড়ন কারো জন্যই কাম্য নয় কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, একজন সহকারী নারী অভিনয়শিল্পী একজন পুরুষের চেয়ে অধিক মানবেতর জীবনযাপন করেন। এই ভিন্নতা স্বতন্ত্র মনোযোগ লাভ করেছে এই গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণে।

কালের পরম্পরায় অসামান্য এই সহকারী অভিনেত্রীরা অসম্মান-নিপীড়ন ও জীবন সংগ্রামকে সঙ্গী করেই সহযাত্রী হয়েছেন রঙ্গমঞ্চ থেকে রুপালি পর্দার শ্রীবৃদ্ধিতে। অথচ পরিচালক-প্রযোজক-পরিবেশক-তারকা থেকে শুরু করে দ্রব্য সরবরাহকারীকারী পর্যন্ত সবার কাছ থেকে তাচ্ছিল্য, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, নিন্দা প্রাপ্তিই কেবল ঘটেছে। একটু অভিনয় করবার আশায় সিনে-প্রাঙ্গণকে আঁকড়ে ধরে থেকেছেন। দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান, সবাক-নির্বাক, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চরিত্রে অভিনয়ের আশায় 'অতিরিক্তা'র গ্লানি নিয়ে জীবন পাড়ি দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন।

পাটাতন

> বিশ বছর আগে দুই টাকা নিয়া লুকাইয়া এই ঢাকায় আসছিলাম। নায়িকা হইতে আসছিলাম। এফডিসি খুঁইজা বের করলাম। এফডিসির গেইটে কয়েকদিন ঘোরাফেরা করলাম। এরপর এক ক্যামেরাম্যান নিয়া থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা কইরা দিলো। মাসে

> এক হাজার টাকা থাকার ভাড়া ছিল। কাম আছিল তখন। এখন কাম নাই। আর কিছু কইতে পারব না, এখন যান।[১]

একদিন নায়িকা হবে, কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ে সুযোগ পাবে, রঙিন পোস্টারে ছবি ছাপা হবে, রুপালি পর্দায় সবাই দেখবে– এমন স্বপ্নের হাত ধরেই চলচ্চিত্র শিল্পে আগমন ঘটে অধিকাংশ অভিনয়শিল্পীর। একজন অভিনয়শিল্পী চলচ্চিত্র শিল্পের প্রাণ, কাহিনির মূল বিষয়বস্তু দ্রুত দর্শকমনে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। এই মাধ্যমকে আশ্রয় করেই দর্শক হৃদয় কাহিনিমুখী হয়। চলচ্চিত্রে-দর্শকে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কাহিনি এগিয়ে যায় নির্ধারিত গন্তব্যে। চিত্রনাট্যে একাত্ম হয়ে দর্শক কখনো আনন্দিত হন, কখনো কাঁদেন, আপন মনে হেসে ওঠেন, ঘৃণা করেন আবার বিদ্রোহীও হয়ে ওঠেন। সে অর্থে, অভিনয়শিল্পী চলচ্চিত্রের বোধ জাগানিয়া কারিগর। দর্শক হৃদয়কে কাহিনিমুখী করায় তাদের বিকল্প নেই। ডিজিটাল একাডেমি দ্য ফিল্ম স্কুল ব্লগে প্রকাশিত 'দ্য রোল অব অ্যাক্টর ইন ফিল্ম মেকিং' শীর্ষক নিবন্ধে চলচ্চিত্র নির্মাণে অভিনয়শিল্পীর গুরুত্ব সম্পর্কে লিখিত রয়েছে, "একজন অভিনেতা একজন শিল্পী। দৃশ্যমান মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কার্যক্রমে যা কিছু ঘটে তার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে অভিনেতা অভিনেত্রী। যারা চলচ্চিত্রে বিষয়বস্তুকে দর্শকদের মাঝে সাবলীলভাবে তুলে ধরেন। গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতার একজন চালকের সাথে অভিনেতাকে তুলনা করা যেতে পারে।"[২]

চলচ্চিত্র এক ভ্রমণ। অভিনয়শিল্পী হলেন ভ্রমণ নির্দেশক। ভ্রমণদ্রষ্টা তার সহযোগিতায়ই যাত্রা শুরু এবং সমাপ্ত করেন। এই ভ্রমণের প্রয়োজনেই ক্ষুদ্র-বৃহৎ, মুখ্য-গৌণ ভূমিকার আগমন ঘটে চলচ্চিত্রে। সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীরা সেই প্রয়োজনেরই অংশ।

পর্দায় উপস্থিতির ব্যাপ্তি এবং চরিত্র অনুসারে অভিনয়শিল্পীদের শ্রেণিকরণ করা হয়। চলচ্চিত্র অভিনয়শিল্পী হাসান ইমামের মতে, "চরিত্র অনুসারে অভিনয়শিল্পীদের সাধারণত শ্রেণি বিভাজন রয়েছে– ১. নায়ক-নায়িকা, ১ক. খলনায়ক-খলনায়িকা; ২. চরিত্র শিল্পী ২ক. কৌতুক শিল্পী; ৩. সহশিল্পী।"[৩]

অর্থাৎ, চলচ্চিত্রে কেউ রূপদানকারী নায়ক-নায়িকা, কেউ খলনায়ক-খলনায়িকা, চরিত্র শিল্পী, কৌতুক শিল্পী এবং সহশিল্পী। ক্রমানুসারে এক্সট্রা শিল্পীরা সহশিল্পী পর্যায়ের। জিজ্ঞাসা হলো, এক্সট্রা প্রত্যয়টি তাহলে কোথা থেকে এল! কে বা কারা, কেনই বা একদল শিল্পীকে 'এক্সট্রা' নাম জুড়ে দিলো? খাবার এক্সট্রা থাকতে পারে, কাপড় এক্সট্রা থাকতে পারে কিন্তু যে মানব দৃশ্যে-অদৃশ্যে শিল্পের সাথে যুক্ত সে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এক্সট্রা হবে? প্রেক্ষাগৃহের সংশ্লিষ্ট প্রযোজক-পরিচালক-পরিবেশক থেকে শুরু করে প্রোডাকশনের চা পরিবেশন করা ব্যক্তির নিকট পর্যন্ত তারা এক্সট্রা শিল্পী হিসেবে উপেক্ষিত। অথচ কাহিনির স্বার্থেই এরা অপরিহার্য। তা সত্ত্বেও 'এক্সট্রা' শব্দ ছাপিয়ে এ

---

[১] *ইসলাম, তামান্না (২০১৬), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ৩ অক্টোবর ২০১৬।*

[২] *ডিজিটাল একাডেমি দি ফিল্ম স্কুল (২০১৬) 'রোল অব এন অ্যাক্টর ইন ফিল্ম মেকিং,' ডিজিটাল একাডেমি দি ফিল্ম স্কুল, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2havaEp, *সর্বশেষ পঠিত: ২৮ অক্টোবর, ২০১৬; অনুবাদ গবেষকের।*

[৩] *ইমাম, হাসান (২০১৭), বর্তমান গবেষণা মূল্যায়নের মন্তব্য থেকে গৃহীত, মে ২০১৭।*

সহকারী বা জুনিয়র শিল্পীরা সহ-অভিনয়শিল্পী হিসেবে সম্বোধিত হতে পারছেন না– সময় বিশেষে সম্বোধিত হলেও যোগ্য মর্যাদা পাচ্ছেন না।

ব্যাখ্যায়িত শ্রেণিবিভাজনে সহকারী অভিনয়শিল্পীরা তাচ্ছিল্যের। তারা চলচ্চিত্রের প্রান্তিক শিল্পী হিসেবে নানারকম নিপীড়নে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছেন। লৈঙ্গিক বিভাজন এই প্রান্তিক অভিনয়শিল্পীদের নিপীড়ন দশাকেও বিভাজিত করেছে। লিঙ্গীয় পরিচয়ের কারণে সহকারী নারী অভিনেত্রীকে যৌন নিপীড়নের শিকার হতে হয়। জৈবিক কারণে পুরুষ এবং নারীর সামাজিক ভূমিকা ভিন্ন হতে বাধ্য হয়– এই মৌলিক সত্যটি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এই ভিন্নতা নারীকেই আঘাত করে এসেছে চিরকাল। শিল্প-সাহিত্য-সমাজে সতীত্ব ধারণা চিরকাল জিইয়ে রাখা হয়েছে সীতার জন্য। 'রামের সতীত্ব'– এমন কথা কে কবে কোথায় শুনেছে? সেই কারণেই একজন সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীর জীবন সংগ্রাম সমশ্রেণির পুরুষ অভিনয়শিল্পীর চেয়েও নগণ্য এবং ঝুঁকিপূর্ণ। পরিপ্রেক্ষিতে, শিক্ষা-দক্ষতা-সৃজনে নারী-পুরুষ যতই সমান্তরাল হোক জীবন সংগ্রামের পথটা অসমান্তরালই থাকে। পৃথিবীর সর্বত্রই এই তারতম্য বিরাজমান। লিঙ্গীয় পরিচয়, সামাজিক রক্ষণশীলতার ফলে নারী এখানে পুরুষের তুলনায় কম মর্যাদায়িত এবং নির্মিত নারী চরিত্রের ভূমিকা নির্ধারিত হয় পুরুষের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে।

অপরদিকে, পুঁজিবাদী গণমাধ্যমের লাভজনক বাণিজ্যের উদ্দীষ্টজন হলেন নারী। নারীর পর্দায় উপস্থিতি বিশ্লেষণ করলে এমনটিই প্রতিভাত হয়। কামনা-লালসার বেড়াজালে চলচ্চিত্র নারীকে যেভাবে নির্মাণ করেছে সেখানে নায়িকার রূপ, অর্থবিদ্যা, পোশাক-পরিচ্ছদ, তথাকথিত 'সভ্যতা' থাকা সত্ত্বেও নায়কের তুলনায় কম মূল্যায়িত হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। এহেন প্রেক্ষাপটে, সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীর অবস্থান সহজেই অনুমেয়। সহকারী নারী অভিনয়শিল্পী চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র অপেক্ষা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন পিছিয়ে, তেমনি সমপর্যায়ে অভিনয় করে পুরুষ অভিনয়শিল্পীর চেয়ে পশ্চাতে। প্রথাগত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, পুঁজিবাদ এই নারীদের জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে সংকটাপন্ন। প্রচলিত ধারণায় এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক, কেননা সহকারী বা জুনিয়র নারী অভিনেত্রীদের শিক্ষা-অর্থ-গ্ল্যামারে পশ্চাদপদ হওয়ার পক্ষে অনুযোগ রয়েছে; যেমন, এদের বিদ্যা নেই, মেধা নেই, আগ্রহ নেই, কথা বলার ধরন নেই, শারীরিক চাকচিক্যে ঘাটতি, পোশাকে রুচি নেই, চরিত্র নেই, ইত্যাদি। চলচ্চিত্রের শ্রমঘনিষ্ঠ এই নারী অভিনয়শিল্পীদের যে অতীত পটভূমি, তাতে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপস্থিতির ঘাটতিই বাস্তবতা। কিন্তু আশার কথা, বিভিন্ন প্রয়োজনে হলেও তারা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। তারা অভিনয় করার চেষ্টা করেন।

অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে চলচ্চিত্রে সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীর অবদানও বহুমাত্রিক। কখনো সবাক, কখনো নির্বাক, কখনো দৃশ্যমান, কখনো ছায়ারূপে, কখনো স্বল্প, কখনো দীর্ঘ সময়জুড়ে পর্দায় উপস্থাপন ঘটে তাদের। বিশেষত, নায়িকার উপস্থিতিকে উজ্জ্বল করায়, নায়িকার নৃত্যকে বর্ণাঢ্য করায়, কলেজ-ক্যাম্পাসে নায়িকাকে মধ্যমণি হিসেবে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে ডানে-বামে-পিছনে, ধর্ষণের দৃশ্যে নায়িকার শ্লীলতা রক্ষার্থে এই শিল্পীরা ডামি চরিত্ররূপেও অভিনয় করেন।

সিনেমার শুরুতে ঝলমলে রুপালি পর্দায় লাল-নীল অক্ষরে কেন্দ্রীয় অভিনয়শিল্পীদের নাম ভেসে ওঠে। দর্শক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে নায়ক-নায়িকাসহ প্রিয়জনদের নামের জন্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় ভূমিকার বাইরেও যে অসংখ্য শিল্পীর শ্রম রয়েছে, যারা কাহিনির স্বার্থে ক্ষণিকের প্রয়োজনে পর্দায় আসেন আবার হারিয়ে যান, তাদের জন্য কেউ অপেক্ষা করে না। পরিবার-সমাজ-চলচ্চিত্রের সর্বত্র তাদের অবস্থানের স্বরূপটি তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষার। সহকারী নারী অভিনয়শিল্পী জেসমিন আক্তারের বক্তব্যে তাই আক্ষেপের সুর স্পষ্ট :

"চলচ্চিত্রের পিলার আমরা কিন্তু ফেমাস কেউ নই। তাছাড়া বাঙালি নারীকে সবসময় আড়চোখে দেখে।"[৪]

এই নারীরা অভিনয় করলেও তাদের অভিনয়কে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা লক্ষণীয় নয়। চলচ্চিত্র নৃত্য পরিচালক সাইফুল ইসলাম বলেন, "এক্সট্রা ক্ষণিকের জন্য। শ্যুটিংয়ের স্বার্থে তাদের আনা হয়। এরা হলো দিনমজুরের মতো। এদের কাজ খুঁজতে হয়। কাজ এদের খোঁজে না। এদের আবার সর্দার আছে। সর্দারদের মাধ্যমে এরা কাজ পায়।"[৫]

পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রবল অমানিশায় নিমজ্জিত এই শিল্পীরা। শিল্পী হিসেবে তাদের ঘর মানেন না, পরও মানেন না, এমনকি যে চলচ্চিত্রের কারণে সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয় সেই চলচ্চিত্রও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক পাততে চায় না। এ এক গোলকধাঁধা। এ এক বঞ্চনা। এক পরিচয়হীনতার প্রবঞ্চনা। তারপরও এই শিল্পীরা আসেন; আসেন চলচ্চিত্রে অভিনয়ের আশায়।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ছয় দশক পার করেছে। দীর্ঘ প্রায় চার দশকের উপর ছিল জমকালো। গত প্রায় দুই দশক সময় ঢাকাই চলচ্চিত্র অতীত জৌলুস হারিয়ে জীর্ণশীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মনে কড়া নাড়ছে এ শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফেরানোর গুরুত্ব। চলচ্চিত্র সংকট উত্তরণে চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট, নির্মাণশৈলী, দর্শকবিমুখতার কারণ, চলচ্চিত্র প্রযোজক-নির্মাতা, নায়ক-নায়িকার মধ্যে শিল্পমানের চেয়ে এক রাতে বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ের সংকট, সহিংসতামুখর সিনেমা ইত্যাদি বিষয় নতুন নির্মাতা, নতুন প্রযোজক, সিনেমা সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগ গ্রহণে তাড়িত করছে, তথাপি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না সহকারী অভিনয়শিল্পীদের সংকট ও নিপীড়ন দশা। অসংখ্য চরিত্রের একক হিসেবে এক একজন শিল্পী ইন্ডাস্ট্রিতে আসছেন আবার হারিয়ে যাচ্ছেন। অনেকে থেকেও কাজ পাচ্ছেন না। শ্রমের সম্মান-সম্মানী কোনোটাই মিলছে না। পরিবার-সমাজ-ইন্ডাস্ট্রিতে শিল্পীজীবন পার করে দিচ্ছেন একজন 'অতিরিক্তা'র গ্লানি নিয়ে। প্রবল তাচ্ছিল্যের পরও তারা অভিনয় করছেন মঞ্চ থেকে বোকাবাক্সে। ছুটছেন, কেবল ছুটছেন, তাল সামলাতে পারছেন না।

ঝকমকে গ্ল্যামারের অন্তরালে যেমন রয়েছে হতাশা-অপ্রাপ্তির জ্বালা। স্পটলাইটের রুপালি আলোর বিপরীতে যেমন ছায়াময় এক অবয়ব– চঞ্চল নদীর যেমন রয়েছে এক মরুদ্যান চর, প্রান্তিক এ অভিনয়শিল্পীদের জীবনেও রয়েছে তেমনি নানা চড়াই-উতরাই। তারা যে আশা ও স্বপ্ন নিয়ে রুপালি

[৪] *আক্তার, জেসমিন (২০১৬), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৬।*

[৫] *ইসলাম, সাইফুল (২০১৬), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।*

পর্দায় এসেছিলেন, যে আশা নিয়ে আসেন, তা সময়ের সাথে সাথে নিকষ কালো আঁধারে ঢেকে যায়। বেলাশেষে এই সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যার ফলে একজন শিল্পীকে কখনো কখনো ভিক্ষাবৃত্তির মতো অসম্মানজনক কাজ বেছে নিতে হয়। বুর্জোয়া পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর ফলে শ্রমঘনিষ্ঠ এই নারীদের শিল্পী জীবন আহত হয় নানারকম নিপীড়নের আঘাতে। অধিকাংশজনই বেঁচে থাকার তাগিদে নিষ্ফল সংগ্রাম করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থানে অনেককে হাত পাততে হচ্ছে। কেউবা পরিবারের একবেলা খাবারের নিশ্চয়তা নিয়ে ঘরে ফিরতে পারছেন, কেউবা মিশে যাচ্ছেন শহরের নিয়ন আলোর ছায়ায়।

শিল্পীর এই নিপীড়ন চিত্র নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্রের পরিবেশ উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায় স্বরূপ। যে কোনো ধরনের চিত্রায়নেই হোক, পর্দায় একজন শিল্পীর অসম্মান-অনিরাপত্তা-নিপীড়িত অবস্থাকে শিল্প কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারে না। এড়িয়ে যেতে পারে না শিল্পীর সম্ভাবনাকে। এড়িয়ে যেতে পারে না সামান্য থেকে সুপারস্টার এবং সুপারস্টার থেকে সামান্য হওয়ার সম্ভাবনাকে। চলচ্চিত্র গবেষক অনুপম হায়াৎ-এর মতে, "অতীতে ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকে সহকারী অভিনেত্রী হিসেবে অভিনয় জগতে এসেছেন যারা পরবর্তীকালে সুপারস্টার হয়েছেন। এমন অনেক গুণী অভিনেত্রীকে কিন্তু সহকারী শিল্পী থেকেই পেয়েছে ঢাকাই চলচ্চিত্র। তারকা রোজিনা ১৯৭৬ সালে কালিদাস বাবুর 'জানোয়ার' চলচ্চিত্রে সামান্য একটি চরিত্রে অভিনয় করেন। একটি ট্রেতে কিছু গ্লাস ও একটি বোতল নিয়ে টেবিলে রাখেন। পরবর্তীতে এফ কবির চৌধুরীর 'রাজমহল'-এ নায়িকা হলেন। তারপর তো আর ফিরে তাকাতে হয়নি। উনারা দর্শকমনে আজো প্রজ্বলিত।"[৬]

কোনো শ্রমই অমূলক নয়। যুগ-যুগান্তরের এই সকল সাফল্যগাথা আশা জাগানিয়া। সহকারী বা জুনিয়র নারী অভিনয়শিল্পীদের যে বিশাল বহর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছে নিঃসন্দেহে তাঁরা আলোকবর্তিকায় রূপান্তরিত হতে পারেন। চলচ্চিত্রের বর্তমান সংকটপ্রবণ ক্ষণে এই শিল্পীরা বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হয়ে উঠতে পারেন। প্রয়োজন শুধু তাদের অতিরিক্ত না ভেবে অংশরূপে ভাবা। এই শিল্পীদের বিদ্যমান অসংখ্য সীমাবদ্ধতা দূর করে সম্পদে রূপান্তর করবার কৌশল-উপায়-প্রক্রিয়া খুঁজে বের করা।

একটি কাহিনির পরিস্ফুটন কোনো একক চরিত্রায়নে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে পারে না। কাহিনিকে যথাযথরূপে উপস্থাপনে প্রয়োজন বিভিন্ন ভূমিকার কলাকুশলী। এ প্রসঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থাপক ফয়েজ বলেন, "জুনিয়র ছাড়া চলচ্চিত্র হয় না। জুনিয়র ছাড়া সিনিয়রের মূল্য নাই। জুনিয়র ছাড়া যদি চলত তাহলে তো নায়ক-নায়িকা আর ভিলেন ছাড়া কাউকে প্রয়োজন হতো না।"[৭]

সাধারণত, দর্শকের মূল আকর্ষণ নায়ক-নায়িকা-ভিলেন– সংখ্যায় যারা মাত্র তিনজন। এই তিনজনের পক্ষে দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখা কি সম্ভব? বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে এমন নিদর্শন খুঁজে

[৬] *হায়াৎ, অনুপম (২০১৬), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ১০ অক্টোবর ২০১৬।*

[৭] *ফয়েজ, মোহাম্মদ (২০১৬), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ২২ নভেম্বর ২০১৬।*

পাওয়া যায় না। চলচ্চিত্রে কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র বলতে নায়িকা। নায়িকার আশেপাশে বিভিন্ন সহকারী চরিত্রে কত নারী মুখই দেখা যায়। তাদের কেউ সংলাপময়, কেউবা সংলাপহীন। কিন্তু এই নারীদের নামের তালিকা পূর্ণাঙ্গভাবে ইন্ডাস্ট্রির কোনো সমিতিতেই নেই। পর্দায় যে ছায়াটিকে উপস্থাপন করা হয় সেও তো চলচ্চিত্রের প্রয়োজনেই অভিনয় করছে। তবে তিনি কেন শিল্পী হিসেবে মর্যাদা লাভ করবেন না? শিল্পী হয়েও তাদেরকে দিনমজুরের জীবন কেন যাপন করতে হবে? নিয়মিত কাজ, মৌলিক প্রয়োজন পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও কেনইবা তারা অভিনয় ছেড়ে যান না? শুধু কি টাকার জন্য? নাকি শিল্পী মন শিল্প আঁকড়ে থাকতে চায়?

মানুষ যখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করে তখন প্রথম শ্রেণি থেকে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বগামী হয়। যখন কর্মজীবন শুরু করে তখনো যে পদে যোগদান করে সময়ের সাথে সে ঊর্ধ্বগামী হয়। চলচ্চিত্রে সহকারী নারী শিল্পীদের (এক্সট্রা) ক্ষেত্রে কেন ভিন্ন? সিনে-ইন্ডাস্ট্রি কেন প্রয়োজনানুগ তালিম দিয়ে আনাড়ি এ শিল্পীদের মান বৃদ্ধি করতে পারে না? একজন অভিনয়শিল্পী হিসেবে কেন পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের কাছে সকলের গ্রহণযোগ্যতা নেই? কেন তাদের পরিচয় গোপন করে বাড়ি ভাড়া নিতে হয়? কেন গভীর রাতে শ্যুটিং শেষে তাদের যাতায়াতে নিরাপত্তা নেই? কেন তারা কেন্দ্রীয় চরিত্রের পাত্রপাত্রীর সাথে এক সারিতে বসে খেতে পারেন না? পরিচালক-প্রযোজকের সাথে কেন তাদের সরাসরি যোগাযোগ হয় না? কেনইবা চলচ্চিত্রে তাদের শারীরিক, মানসিক ও অনৈতিক হয়রানির শিকার হতে হয়?– ইত্যাদি জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে সমাজ বাস্তবতায় নারী, বৈশ্বিক কাঠামোতে চলচ্চিত্র ও নারী, উপমহাদেশীয় কাঠামোতে চলচ্চিত্র ও নারী, বাংলাদেশ কাঠামোতে চলচ্চিত্র ও নারী, চলচ্চিত্র ও সহকারী নারী অভিনয়শিল্পী বিষয়সমূহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার আবশ্যকতা প্রতিভাত হয়।

সমাজ বাস্তবতায় নারী

> পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিন্যাসে 'নারী-নির্মাণ' প্রক্রিয়ার পুরোধা নারী নয়, পুরুষ। কোনও সমাজে নারীর আনুপাতিক হার যদি পুরুষের চেয়ে বেশি হয়, সেক্ষেত্রেও এ প্রক্রিয়ায় চাবিকাঠি থাকবে পুরুষের হাতে। এ এক 'অমোঘ' সামাজিক রীতি প্রায় স্থানকাল নির্বিশেষে।[৮]

একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা যায় যে, আদি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সদা সর্বদাই কড়া নেড়ে জানান দেয় যে, উত্তম যা তা চিরকাল পুরুষের জন্যেই তুলে রাখা। নারী-পুরুষের জন্মপ্রক্রিয়া অভিন্ন হলেও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিস্তর ভিন্নতা বিরাজমান, যে প্রক্রিয়ার ছলে পুরুষ কেন্দ্রবিন্দু, নারী প্রান্তিক। এই প্রান্তিকজনেরা লিঙ্গাশ্রয়ী বঞ্চনায় জর্জরিত। বঞ্চনার জাঁতাকলে মানব জন্মের বিকাশ কঠিন। ক্ষমতার সূক্ষ্ম কলে নারীর মানুষ হয়ে ওঠার সকল দ্বার কণ্টকাকীর্ণ। সংসার-সমাজ, রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, ধর্ম-অধর্ম সব স্থানেই নারীর নির্মাণ অন্তঃকোণে থাকা এক চাবি দেওয়া পুতুলের মতো, যেখানে সে কতটুকু হাঁটবে, কতটুকু বলবে, কতটুকু বুঝবে,

---

[৮] *উদ্ধৃত, সিংহ, দীপঙ্কর (২০১১), 'নারী ও মিডিয়া : উপস্থাপনার সূত্র সন্ধান,' বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, নারী পৃথিবী: বহুস্বর, কলকাতা: উর্বী প্রকাশন, পৃ. ৪১৬।*

কতটুকু শিখবে, কতটুকু চাইবে সবকিছুতেই একটি লক্ষ্মণরেখা টানা রয়েছে। সেই রেখা যখনই কেউ লঙ্ঘন করতে চেয়েছে তখনই তাকে সমাজের এককোণে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবে সর্বপ্রাচীন শাস্ত্রসাহিত্যের নানা চিত্রকল্পে নারীর অবস্থান সবসময় এক রকম ছিল না। কোথাও কোথাও নারীর অধিকার ভোগের নিদর্শনও পাওয়া যায়।

ভারত উপমহাদেশের প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্র চতুর্বেদের মধ্যে সর্ব প্রাচীন ঋকবেদ। সেই রচনার বর্ণনা অনুযায়ী নারীর শিক্ষা লাভের অধিকার ছিল। শিক্ষার অধিকার ছাড়াও নারীর ঋষিকার হওয়ার প্রচলন ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর লড়াই করারও সাক্ষ্য রয়েছে। সুকুমারী ভট্টাচার্যের 'বৈদিক যুগে নারী' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে, "বিশ্‌পলা যুদ্ধে একটি পা এবং বধ্রিমতী একটি হাত হারান। বধ্রিমতী এবং শশীয়সী তাদের বীরত্বের জন্যেও উল্লেখিত হয়েছেন। ...দয়াল পিতারা বালবিধবা কন্যাদের শিক্ষা দিতেন।... তাদের মধ্যে আছেন বিশ্ববারা, ঘোষা, গোধা, অপালা। যাজ্ঞবল্ক বিদূষী কন্যা লাভের জন্যও একটি অনুষ্ঠানের নিয়ম বলেছেন। ...ঋগ্বেদ একাধিক ঋষিকার বিষয়ে অবহিত... গার্গী এবং মৈত্রেয়ী এর নিদর্শনা।"[৯]

এই শাস্ত্রে নারীর আচার্য হওয়ার অধিকারের কথা যেমন রয়েছে তেমনি কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঋষিকে তর্কে কোণঠাসা করার জন্যে তিরস্কৃত হওয়ার চিত্রও রয়েছে। গার্গীর যুক্তিসংগত তর্কে যাজ্ঞবল্কের অযাচিত তিরস্কারে সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব ফুটে ওঠে : "আর প্রশ্ন কোরো না তোমার মাথা খসে পড়ে যাবে।"[১০]

বৈদিক যুগের আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, শিক্ষা গ্রহণে নারীর অভিগম্যতা থাকলেও রক্ষণশীল সমাজে নারীর যুক্তিসংগত তর্ক ছিল আপত্তিকর। সর্বপ্রাচীন শাস্ত্রসাহিত্যে সমাজে নারীর অবস্থান যতটুকুই স্বাচ্ছন্দ্যের ছিল, সেটুকুও ধীরে ধীরে হরণ হতে দেখা যায়।

লক্ষণীয়, বৈদিক যুগের প্রারম্ভে নারীদের কিছুটা সম্মান থাকলেও পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে বর্ণাশ্রম, জমির মালিকানা, পিতৃসূত্রানুযায়ী উত্তরাধিকার প্রথায় নারীর পরিসর সংকোচন করার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে নারী নির্বাসিত হতে থাকে অন্তঃপুরে। সেই সময়ে অন্তঃপুরের বাইরে যে নারীই গেছে সে-ই সমাজে নিন্দনীয় হয়েছে। জ্ঞানার্জনসহ যাবতীয় শিল্পকলা চর্চায় সেই নারীদেরই অধিকার ছিল যারা নিন্দার তকমা মেখে অন্তঃপুরের বাইরে জীবনযাপন করতেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "প্রাচীন ভারতে তারাই ছিল নারীসমাজের একটি মাত্র শ্রেণি যারা সরকারি খরচে শিক্ষালাভ করত। নানা সুকুমার কলায় শিক্ষালাভ করে তারা তাদের খদ্দেরদের এমনভাবে আনন্দ দিত যা তাদের শিক্ষাবঞ্চিতা পত্নীরা পারত না।"[১১]

বাৎসায়ন তার কামসূত্রে বলেছেন, "কুমারী কন্যার একান্তে চৌষট্টি কামকলার অভ্যাস করা

---

[৯] *ভট্টাচার্য্য, সুকুমারী (২০০৬), 'বৈদিক যুগে নারী,' প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, পৃ. ২।*

[১০] *উদ্বৃত, ভট্টাচার্য্য, প্রাগুক্ত।*

[১১] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯।*

উচিত।"[১২] "পতিব্রতা স্ত্রীর উচিত পতিকে দেবতা মেনে তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও প্রীতি রেখে এবং তার মন-মতো ব্যবহার করে তার সম্মতি অনুযায়ী গৃহ-ব্যবস্থা করে, ঘর স্বচ্ছ, সুগন্ধিত ও পুষ্পময় করে রাখা। ঘরে যজ্ঞ হোম ও সন্ধ্যা অনুষ্ঠান নিয়মিত অনুষ্ঠিত করে নিজ শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ এবং নন্দাই ইত্যাদি স্বজনবর্গকে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করা। ...কখনো দরজা জানালায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না থাকা। পরপুরুষের সঙ্গে নির্জন স্থানে কথা না বলা।"[১৩] এরূপভাবে বাৎসায়ন পতিব্রতা রমণীর কর্তব্য সম্পর্কে লাইনের পর লাইন লিখে পাতা ভারী করেছেন, যা কেবল নারীকে রুদ্ধ করে রাখার এক দুরভিসন্ধিকেই প্রকাশ করে। তিনি এও বলেছেন, "অন্তঃপুরের স্ত্রীরা একাকী বাইরে যেতে পারে না।"[১৪] অথচ বিলাসী নাগরিকের দিনচর্যায় বলছেন, "সন্ধ্যাকালে গানবাজনা করে আনন্দ করা বাঞ্ছনীয়। বিলাসী পুরুষ এর পরে রতিসদনকে সাজিয়ে নায়িকার প্রতীক্ষা করেন।... এই কার্যক্রম নিজের স্ত্রীর জন্য নয়, বরং অভিসারিকা রমণীর জন্য।"[১৫] স্ত্রীর অন্তঃপুরের বাইরে যাওয়া যেখানে নিষিদ্ধ সেখানে বিলাসী পুরুষের পরনারীর সাথে রতিসদনকে সমর্থন করেছে সমাজ।

লক্ষণীয়, অন্তঃপুরের রমণীর জন্যে যা যা নিষিদ্ধ, নিন্দিত রমণীর জন্যে সেগুলোই কখনো কখনো যোগ্যতার মাপকাঠি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণের সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে, "রূপগুণ বিদ্যাবুদ্ধি সমন্বিত সুন্দরী তরুণীকেই গণিকাধ্যক্ষ গণিকা আখ্যা দিতেন।... রাজ-অন্তঃপুরে গণিকারা ভালো বেতনে নিযুক্ত হতেন বিভিন্ন কাজের জন্য। শোভার উৎকর্ষ অনুসারে তারা রাজার ছাতা, জলপাত্র, পালকি, বসবার জন্য কাঠ, পাথর বা ধাতুনির্মিত আসন ও রথ সম্পর্কিত বহনের কাজে বিশেষভাবে নিযুক্ত হতেন।"[১৬] স্পষ্টতই প্রতীয়মান, গণিকাকে রূপ-বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন নারী হতে হতো। নৃত্য-গীত-বাদ্যের মতো সুকুমার কলার চর্চা জানতে হতো। শোভাবর্ধনে রাষ্ট্রীয় কার্যে তারা নিযুক্ত থাকতে পারতেন। কার্যক্ষেত্রে সম্মানী ছিল কিন্তু সম্মান ছিল না। সমাজ ব্যবস্থা তাদের মন্দ নারী হিসেবেই আখ্যায়িত করেছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দীর পালাবদল ঘটেছে। নারীর সামাজিক অবস্থার বিশেষ বদল হয় নি। সুকুমার কলা চর্চাব্রতা রমণী কখনো নগরের কোণে এক সীমানায়, কখনো মঞ্চে, কখনো পর্দায় তার শিল্পের প্রকাশ ঘটিয়েছে। মানুষকে বিনোদিত করেছে কিন্তু মন্দ আখ্যা থেকে রেহাই পায় নি। সেকাল-একাল সর্বকালেই বিনোদিনী ও কানন দেবীদের সমাজে চটুল বাণে রক্তাক্ত হতে হয়েছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সুপারস্টার নায়িকা কানন দেবীর অশোক মৈত্রকে বিয়ের পরবর্তী প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লেখায় সে মর্মবেদনা স্পষ্ট।

"সমাজ আমাদের মিলনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু সম্ভ্রমের বরণডালা দিয়ে বরণ

---

[১২] *বাৎসায়ন (১৩১৩), কামসূত্র, মহেশ চন্দ্র পাল সম্পাদিত সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ, কলকাতা: বঙ্গভাষা কার্যালয়, পৃ. ৮।*

[১৩] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।*

[১৪] *প্রাগুক্ত।*

[১৫] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।*

[১৬] *উদ্ধৃত, নাসরীন, সৈয়দ তানভীর (২০১১), 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীর অবস্থান,' বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, নারী পৃথিবী: বহুস্বর, কলকাতা: উর্বী প্রকাশন, পৃ. ২৯।*

করেনি। আমাদের দুঃসাহসের সাক্ষী হয়েছে কিন্তু উৎসবের আলো জ্বালিয়ে একে অভিনন্দিত করেনি।... আজও মনে পড়ে, বারান্দায় দাঁড়াতে সাহস করতাম না। পাছে কারো কোনো বিদ্রূপ মন্তব্য কানে আসে। নানান কুরুচিপূর্ণ কদর্য ভাষায় প্যামফ্লেট ছাপিয়ে উঁচু স্বরে হেঁকে বিক্রি হয় আমার বাড়ির সামনে... নিঃসম্বল অসহায় একটা মেয়ে। কত ঝড় তুফান পেরিয়ে ছুটছে আর ছুটছে, কিন্তু তার সেই বিরামহীন চলা, গ্রন্থিহীন তপস্যার এতটুকু মূল্য কেউ কোনোদিন দেয়নি, চেয়েছে তাকে ব্যর্থতার সমাধিতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে।"[১৭]

সাধারণ পর্যবেক্ষণের আলোকে বলা যায়, নারী-পুরুষের বৈষম্য যুগ যুগ ধরে সুকৌশলে জিইয়ে রাখা হয়েছে এই সমাজে। সমাজের একক হিসেবে, জনসংস্কৃতির বাহক হিসেবে চলচ্চিত্র তার বাইরে নয়। পুরুষতান্ত্রিক গণমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রে নারীর বাস্তবতা সমাজ বাস্তবতার ঊর্ধ্বেও নয়। চটুল দৃষ্টিভঙ্গি, পুঁজিবাদী মানসিকতায় নারী-পুরুষের যুদ্ধটা এক নয়। সেখানেও যে নারীরা আর্থ-সামাজিকভাবে অধিক পিছিয়ে তারা ততই সংকটজনক জীবনযাপন করে।

বৈশ্বিক কাঠামোতে চলচ্চিত্র ও নারী

শুরু থেকেই পুরুষতান্ত্রিক গণমাধ্যম সমাজ কাঠামোর লিঙ্গবৈষম্যকে জিইয়ে রাখে। গণমাধ্যমে নারীর যে প্রতিচিত্র ফুটে উঠতে থাকে তা কখনো মনু, কখনো কৌটিল্য বা কখনো বাৎসায়নের ভাবধারার। পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের অন্যতম সহায়ক-ধারক-বাহক গণমাধ্যম ক্রমাগত এই স্রোতকে নিয়ে যেয়ে মিশিয়ে দেয় হেফনার-টার্নার-গেটসের বৈশ্বিক স্রোতে।[১৮]

চলচ্চিত্রে নারীর অংশগ্রহণ

বৈশ্বিক স্রোতেও লিঙ্গবৈষম্যের স্বরূপ অভিন্ন। এই বৈষম্যের অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে পর্দায় অভিনয় উপস্থিতি ব্যতীত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ছিল সামান্যই। এ প্রসঙ্গে অনুপম হায়াৎ বলেন, "এটা স্বীকার করতে হবে যে চলচ্চিত্র আবিষ্কারের ইতিহাসে নারীর কোনো অবদান নেই। চলচ্চিত্রের মূল বাহন ক্যামেরা শব্দটির সঙ্গে বিজ্ঞানীরা পুরুষ আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে ম্যান সংযুক্ত করে ক্যামেরাম্যান চালু করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও নারীবিহীন চলচ্চিত্র অকল্পনীয়। নারীরা পুরুষ কর্তৃক চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে বাস্তবতার নিরিখে, বিষয়বস্তুর আঙ্গিক সূত্রে, ব্যবসায়িক কারণে।"[১৯]

১৮৯৫ সালের শেষ দিকে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় নির্মিত পৃথিবীর প্রথম চলচ্চিত্রে নারীর অংশগ্রহণ ছিল অভিনয়শিল্পী হিসেবে। 'গণমাধ্যম ও নারী' গ্রন্থে অনুপম হায়াৎ বলেন, "আমেরিকায় প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মিত কাহিনিচিত্র 'লাইফ অব এন আমেরিকান ফায়ারম্যান' (১৯০২)-এ দেখা যায় অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত

---

[১৭] *দেবী, কানন (২০১২), সবারে আমি নমি, ঢাকা: ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন।*

[১৮] *নাসরীন, গীতি আরা (২০০৭), 'কি পড়াই? কেন পড়াই,' রোকেয়া কবীর সম্পাদিত, নারী ও প্রগতি, বর্ষ ২, সংখ্যা ৪, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ১২।*

[১৯] *হায়াৎ, অনুপম (২০১৩), গণমাধ্যম ও নারী, ঢাকা: সমাচার প্রকাশনী, পৃ. ৪৪।*

এক ঘরে আটকে পড়া মা ও শিশুকে। আরেকটি চিত্র 'দ্যা গ্রেট ট্রেন রবারী' (১৯০৪)-তে কয়েকজন নারীকে দেখা যায় ডাকাতদের নিষ্ঠুরতার ভয়ে শঙ্কিত ও আর্তচিৎকৃত অবস্থায়।"[২০] শুরুতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীরা বিভিন্ন চলচ্চিত্রে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। তবে, চলচ্চিত্র আবিষ্কারের এক বছরের মধ্যে কোনো কোনো নারী নির্মাতা হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেন।

অ্যালিস গাই-ব্লাচি হলেন চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম নারী নির্মাতা। চলচ্চিত্র আবিষ্কারের বছরখানেক পর মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। প্রায় ১০০০টির মতো চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে যুক্ত ছিলেন অ্যালিস গাই-ব্লাচি। সমসাময়িককালে হলিউডের প্রথম নারী লুইস ওয়েবার, ডরোথি আর্চনার চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে সফলতা লাভ করেন। এই নির্মাতাদের প্রসঙ্গে থ্রোপে বর্ণিত রয়েছে, "ফ্রেঞ্চ নারী গাই-ব্লাচির জীবন এতটাই চলচ্চিত্র-প্রতিম হেঁয়ালিপূর্ণ যে এটির উপর ভিত্তি করে একটি ফিল্ম তৈরি করা হচ্ছে। অ্যালিস গাই-ব্লাচি তাঁর জীবনে ১০০০টিরও বেশি চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন। তিনি স্পষ্টত স্থাননির্ভর চিত্রগ্রহণ ধারণা উদ্ভাবন করেন এবং প্রথম ক্লোজআপ শট ধারণ করেন।[২১]

নির্মিত সমাজ বাস্তবতায় চলচ্চিত্রে নির্মাণশৈলী এবং ব্যবসায়িক সফলতায় নারীর পদক্ষেপ বৃহৎ পরিসরে গৃহীত না হলেও একেবারেই যে ছিল না তা নয়। কিন্তু চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সেই সকল সাফল্য স্বল্প পরিমাণেই আলোচিত হয়। বর্তমানে, চলচ্চিত্রের প্রায় সকল শাখাতেই নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব মনোযোগ পাবার দাবিদার। চলচ্চিত্রের আধুনিকায়নে কেবল হলিউড নয়, পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু পুরুষ আধিপত্যবাদ এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের জন্যে নারীকে নির্মাতা বা স্রষ্টা ভাববার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ করা যায় না।

চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন

বুর্জোয়া সমাজ কাঠামোতে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আদর্শ নারীরূপ যেভাবে প্রকাশিত, নারীর সৃজনশীলতার রূপটি সেভাবে প্রকাশিত ও স্বীকৃত নয়। পর্দা বিশ্লেষণরূপ তুলে ধরে গবেষক অনুপম হায়াৎ বলেন, "টমাস আলবা এডিসন কর্তৃক নির্মিত ২০ সেকেন্ডের 'দি কিস' (১৮৯৬) চিত্রে একজন নারীকে দেখা যায় পুরুষ কর্তৃক চুমু খেতে।"[২২] শুরু থেকেই নারীর পর্দাউপস্থিতি পুরুষচক্ষু মনোরঞ্জনে নিবেদিত ছিল বলে প্রতিভাত। চলচ্চিত্রে নারীর যে উপস্থাপন নিদর্শন তা বাণিজ্যিক মুনাফা লাভেরই প্রচেষ্টাস্বরূপ।

বিশ শতকের শুরুতে হলিউড কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রে অভিনয়শিল্পী হিসেবে নারীর উপস্থিতিও সম্মানজনক ছিল না। এ প্রসঙ্গে চলচ্চিত্র গবেষক ফাহমিদুল হক বলেন, "বিশেষত হলিউডের ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকের চলচ্চিত্রে নারীর অবস্থান, পতিতা অথবা কুমারী, মূলত এই দুই ভূমিকায় সীমাবদ্ধ

---

[২০] *প্রাগুক্ত।*

[২১] *থ্রপ, জে. আর. (২০১৫), 'সিক্স অ্যামেজিং ফিমেল ফিল্ম ডিরেক্টরস ফ্রম সিনেমা হিস্ট্রি দ্যাট ইউ শুড নো,' বাসেল.কম, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2hB2Ddw*, সর্বশেষ পঠিত: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[২২] *হায়াৎ, অনুপম (২০১৩), গণমাধ্যম ও নারী, ঢাকা: সমাচার প্রকাশনী, পৃ. ৪৪।*

থেকেছে।"[২৩]

পর্যবেক্ষণের আলোকে বলা যায়, সময় অতিবাহিত হয়েছে ঢের। পালাবদল ঘটেছে এ প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্তের। কিন্তু নারীর পর্দাউপস্থিতির আকর পরিচয় আজো নারীর কল্যাণের বিরুদ্ধে। শক্তিমান-বুদ্ধিমান পুরুষের বিপরীতে নারী কেবলই বিজয়ালক্ষ্মী-মমতাময়ী, ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষের দৃষ্টি ও মনোরঞ্জনে উপাদেয় মাত্র– যা নারীর অস্তিত্ববিরোধী। দেশীয় ও বহুজাতিক পরিবর্তনের প্রবাহেও নারী আজো পুরুষের সহকর্মী হয়ে উঠতে পারেন নি। নারী পুরুষের শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের অনুঘটক মাত্র। পুরুষের কামনা চরিতার্থের নিয়ামক।

আর্কষণীয় নারী চলচ্চিত্র বাণিজ্যের প্রধান উপাদান– পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নারী আকর্ষণকে উপজীব্য করার ভাবধারায় আসক্ত। যে আসক্তিতে নারী মর্যাদায়িত হয় তার গ্ল্যামারের উপর ভিত্তি করে। নারীর আর্কষণরূপ তার মূল্যায়নের পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়ায়। 'ভিজ্যুয়াল প্লেজার অ্যান্ড ন্যারেটিভ সিনেমা' প্রবন্ধে লরা মালভি বলেন, "বর্ণনাত্মক ছবি মূলত নিয়ন্ত্রিত হয় নারী-পুরুষ লিঙ্গ সম্পর্কিত মর্যাদার স্তরের ভিত্তিতে। এ ধরনের চলচ্চিত্রের যে দর্শন সেখানে একজন পুরুষের শারীরিক কাঠামো এবং চেহারার অবয়ব কখনোই অবমূল্যায়ন করা হয় না।"[২৪] ফলে নারীর শারীরিক কাঠামো এবং চেহারার অবয়ব মুনাফা অর্জনে মুখ্য হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই নারীর সম্মানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত আনে।

বিশ্ব চলচ্চিত্র কাঠামোতে নারীর অবদান কিংবা চলচ্চিত্রে নারীকে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন নয় বরং প্রকৃত অর্থে নারীর অভিজ্ঞতা এবং জীবনযাপনকে চলচ্চিত্র কতটুকু ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে এটিই মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

উপমহাদেশীয় কাঠামোতে চলচ্চিত্র ও নারী

নারীর অংশগ্রহণ

দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মুম্বাই ও কলকাতায় চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। অবিভক্ত ভারতে চলচ্চিত্রের শুরুতে নাট্যমঞ্চের প্রভাব কমবেশি ছিল। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষক অনুপম হায়াৎ বলেন, "হীরালাল সেন প্রমুখ সেই সময়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে হাত দিয়েছিলেন নাটকের হাত ধরেই, যারা এই চলচ্চিত্রে অভিনয়ে এসেছিলেন তাদের এক পা রাখা ছিল নাট্যমঞ্চে, অপর পা ছিল চলচ্চিত্রে।"[২৫]

থিয়েটার বা চলচ্চিত্র উভয় মাধ্যমেই শুরুতে নারীর অংশগ্রহণ সহজসাধ্য ছিল না। প্রথম দিকের অনেক চলচ্চিত্রে পুরুষই নারী বেশে অভিনয় করতেন। চলচ্চিত্র শিক্ষক ও গবেষক সঞ্জয়

---

[২৩] *হক, ফাহমিদুল (২০০০), 'নারীবাদী চলচ্চিত্র তত্ত্ব পর্যালোচনা,' রোকেয়া কবীর সম্পাদিত, নারী ও প্রগতি, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৬, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৩।*

[২৪] Mulvey, Laura (1999), "Visual Pleasure and Narrative Cinema," in Leo Braudy and Marshal Cohen, eds., Film theory and criticism: *Introductory Readings*, New York: Oxford University Press, pp. 833-44; Translated by researcher.

[২৫] *হায়াৎ, অনুপম (২০১৩), 'চলচ্চিত্র ও নারীর দেশে দেশে,' গণমাধ্যম ও নারী, ঢাকা: সমাচার প্রকাশনী, পৃ. ৪৮।*

মুখোপাধ্যায় বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' নির্মিত হয় ১৯১৩ সালে। পরিচালক দাদাসাহেব ফালকের একান্ত ইচ্ছে ছিল নারী চরিত্রে নারীরাই অভিনয় করুক। তিনি প্রাণপণ চেষ্টাও করছিলেন। বম্বে চষে ফেলেছিলেন, বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দিয়েছিলেন। কোনো উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত রেডলাইট এরিয়া অর্থাৎ গণিকাদের অঞ্চলে গেলেন। অনেক খুঁজে তিনি তিনজন মেয়েকে বাড়িতে আনেন। দাদা সাহেবের স্ত্রী তাদের রান্নাবান্না করে খাওয়ান। চারদিনের মাথায় তাঁরা হঠাৎ বেঁকে বসেন। তাঁরা অভিনয় করবেন না। কেন? তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে তারা বেশ্যা হতে পারে তাই বলে এত খারাপ কাজ তাঁরা করবেন না।[২৬]

প্রেক্ষাপট প্রকাশ করে, তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় একজন অভিনেত্রী গণিকার চাইতে নিন্দনীয় ছিলেন। এরূপ সমাজব্যবস্থায় নারীর অভিনয়ে আগমণ ছিল নিন্দনীয়। যদিও ১৯০১ সালেই হীরালাল সেন কলকাতার থিয়েটারের খণ্ডাংশ চিত্রায়িত করেন এবং সেখানে অভিনেত্রীর ভূমিকায় নারীরাই অভিনয় করে। অনুপম হায়াৎ এর 'গণমাধ্যম ও নারী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, "হীরালাল সেন ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার নাট্যমঞ্চে অভিনীত জনপ্রিয় নাটকের খণ্ডাংশ চিত্রায়িত করেন। এসব দৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন কুসুম কুমারী, প্রমদা সুন্দরী (ভ্রমর), হরিদাসী (সরলা), তারা সুন্দরী প্রমুখ।"[২৭]

বলা যায়, সমাজ বাস্তবতায়, সুদীর্ঘ সময় নারীবেশে পুরুষ অভিনয় করেছে, কিন্তু নারী বিবর্জিত সিনেমায় উপভোগে ঘাটতি ছিলই। বাস্তবিক কারণেই অভিনয়ে নারীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই প্রসঙ্গে লেখক দেবী প্রসাদ ঘোষ বলেন,

> "অভিনেত্রীহীন চলচ্চিত্রকে এক ডানাওয়ালা পাখি বলে মনে হয়। গোড়ার দিকে চলচ্চিত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভূমিকা ছিল না। কাহিনি বিস্তারের সঙ্গে অভিনেত্রীদের প্রয়োজন হয়েছিল সমাজ গড়নের সূত্র মেনে।... রঙ্গালয় শুরুর সময় অভিনেত্রীদের কাজ পুরুষরা বেশ বদল করে চালিয়ে নিতেন। [মাইকেল মধুসুদন দত্ত] 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৭০) নাটকে নারী চরিত্রে অভিনেত্রী নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। তখনকার চলতিধারার বিরুদ্ধে মত ছিল, অভিনেতারা কখনও অভিনেত্রীদের স্থান পূরণ করতে পারে না। তাই চরিত্র অনুসারে অভিনেত্রীদের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল তাঁর কাছে। নাটকের প্রয়োজনে অভিনেত্রীরা এসেছিলেন। যাঁরা এসেছিলেন, সমাজে তাদের স্থান ছিল নিচের দিকে। জাতপাত নয়, নগরের ঘৃণিত অঞ্চল' থেকে তাঁদের নাটকের মঞ্চে আনা হয়।"[২৮]

সময় পরিক্রমায় চলচ্চিত্রের নারীর আগমনের ধারা পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৩১ সালে উপমহাদেশের প্রথম নির্মিত হয় সবাক ছবি 'আলমআরা'। এ ছবিতে প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করেন তৎকালীন গুজরাট নবাব পরিবারের সন্তান যুবাইদা বেগম। 'জুবাইদা বেগম ফার্স্ট ইন্ডিয়ান

---

[২৬] *মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় (২০১৭), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ২৭ মার্চ ২০১৭।*

[২৭] *হায়াৎ, অনুপম (২০১৩), গণমাধ্যম ও নারী, ঢাকা: সমাচার প্রকাশনী, পৃ. ৪৮।*

[২৮] *ঘোষ, দেবী (২০০৯), অভিনেত্রী কথা, কলকাতা: সায়নী প্রকাশনী, পৃ. ৯।*

অ্যাকট্রেস বায়োগ্রাফি' নিবন্ধে এসবি সিধ বলেন, "যুবাইদা বেগম ধানরাজগীর ছিলেন ভারতের প্রথম তুর্কী অভিনেত্রী। মা ফাতেমা বেগম ছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণা। ফাতেমা বেগম ছিলেন নির্বাক চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী। তিনি ভারতীয় ইন্ডাস্ট্রির প্রথম নারী নির্মাতা ছিলেন।"[২৯]

এ ছাড়াও, উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্রের শুরুর দিকে মুম্বাইয়ের সখিনা, কলকাতার কুসুম কুমারী, কানন দেবী, গহর, মায়া রায় অভিনয়ে জড়িত হন। দেবী প্রসাদ ঘোষ বলেন, "চলচ্চিত্রের প্রথম দিককার দিনগুলি অভিনেত্রীদের জীবনে স্বস্তিকর ছিল না। উঁচিয়ে থাকতো নানা প্রলোভনের হাতছানি। সেগুলোকে উপেক্ষা করেই অভিনেত্রীরা অভিনয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন।"[৩০]

ভারতীয় চলচ্চিত্রের শুরুর ইতিহাসের প্রায় এক দশক পর অভিনয়ের পাশাপাশি নির্মাণেও নারীর পদচারণা শুরু হয়। ফাতেমা বেগম (মুম্বাই) প্রথম ভারতীয় নারী প্রযোজক ও পরিচালক যিনি ১৯২৬ সালে 'বুলবুলে পারাস্তান' নির্মাণ করেন। বর্তমানে প্রায় চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকল অঙ্গনেই উপমহাদেশে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়লেও পুরুষের তুলনায় নারীরা এখনো পিছিয়ে রয়েছে। উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে নারীর প্রথম অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে রুহিত ভাট বলেন, "গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প বাণিজ্যিক ও গভীর পর্যবেক্ষণ যোগ্যতাসম্পন্ন কিছু প্রশংসিত নারী পরিচালকের উত্থান দেখছে। কিন্তু তারপরও চলচ্চিত্রের বাণিজ্যটি পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। যাই হোক, বিশ্ব চলচ্চিত্রে নারী পরিচালকদের অর্থপূর্ণ অগ্রগতি নারীদের প্রতি অদম্য দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে বাধ্য।"[৩১]

> দক্ষিণ ভারতের সুপারহিট চলচ্চিত্র 'বেঙ্গালোর ডেইজ' নির্মাতা অঞ্জলি মেনন ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে নারী-পুরুষের ব্যবধান প্রসঙ্গে এক সেমিনারে বলেন, "আমি এমন এক পরিবেশে কাজ করি যার চারপাশটা পুরুষের দখলে। কমার্শিয়াল ছবির হিরোরা নারীদের সঙ্গে যা করেন তাই অনুকরণের চেষ্টা করেন সমাজের পুরুষরা। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নারীদের অংশগ্রহণ আরো বাড়ানো প্রয়োজন। এটা হতে পারে ক্যামেরার আড়ালে অথবা সামনে।"[৩২]

ভগবতী প্রিয়াংবদা 'দি ডার্ক সাইড অব বলিউড,' নিবন্ধে বলেন, "ভারতে চলচ্চিত্রে নারী নির্দেশক, লেখক এবং প্রযোজকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ভারতে নারী নির্দেশকের সংখ্যা ৯.১% যা আন্তর্জাতিক গড় (৭%) থেকে একটু উপরে, আবার নারী লেখকের হার ১২.১% যা আন্তর্জাতিক হারের (১৯.৭) বেশ নিচে। নারী প্রযোজকের হার ভারতে ১৫.২% আর আন্তর্জাতিক হার ২৩.৭%। এই তথ্য থেকে চলচ্চিত্রে লিঙ্গ নির্দেশক বিবেচনা করা যেতে পারে। তাই লিঙ্গ অনুপাত প্রতি ৬.২

---

[২৯] *এসবি সিধ (২০১১), 'জুবাইদা বেগম ফার্স্ট ইন্ডিয়ান অ্যাকট্রেস বায়োগ্রাফি,' মোম্বাই স্পাইডার, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2zRZAmi, *সর্বশেষ পঠিত: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[৩০] *ঘোষ, দেবী (২০০৯), অভিনেত্রী কথা, কলকাতা: সায়নী প্রকাশনী, পৃ. ১০।*

[৩১] *ভাট, রুহিত, (২০১৩), 'উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে ১০০ বছরে নারী পরিচালক,' নিউজ১৮.কম, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2hdJLic, *সর্বশেষ পঠিত: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।*

[৩২] *উদ্বৃত, মেনন, অঞ্জলি (২০১৭) 'যৌনতা মানেই নারী এবং স্তন,' ২৪ আপডেট নিউজ, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2yNxWcE, *সর্বশেষ পঠিত: ১৬ এপ্রিল ২০১৭।*

জন পুরুষের বিপরীতে একজন মাত্র নারী রয়েছেন ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে।"[৩৩]

সংগৃহীত তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে, উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্রে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় পশ্চাদপদ। পিতৃ প্রতিনিধিত্বশীল সমাজ কাঠামোয় নারীর অংশগ্রহণের রূপচিত্রে অসমতা এবং অনিয়মতান্ত্রিকতা বিরাজমান।

নারীর উপস্থাপন

সাধারণত বলা যায়, ভারতীয় চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন ও প্রদর্শনভঙ্গি হলিউডের দোষে দুষ্ট। ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও দর্শক এখনো উপমহাদেশীয় নারীবাদী প্রাচীন ঐতিহ্য ও রক্ষণশীলতার সীমানা অতিক্রম করতে পারে নি। পুরুষচক্ষু মনোরঞ্জনে নারীর আবেদনময়ী উপস্থাপন চলচ্চিত্রের এক অবিচ্ছেদ্য বিষয়। শেলী ওয়ালিয়ার মতে, "যৌনতা বলিউডের একটি পুরনো বিষয়। যেখানে পুরুষ শিল্পীরা অপেক্ষাকৃত লম্বা সময়ের জন্য স্ক্রিন ও সংলাপ পান সেখানে নারীদের ভূমিকা নির্ধারিত হয় স্বল্প বসনে নৃত্য পরিবেশন করা।"[৩৪]

বলা যায়, পর্দাউপস্থিতি বিশ্লেষণ করলে নারীর বঞ্চিত প্রতিরূপ পরিলক্ষিত হয়। বলিউডে নারীর উপস্থাপন প্রসঙ্গে সমালোচক ভাগ্যবতী প্রিয়ামবদা বলেন, "এখানে নারী তারকাদের কেবল নগণ্য কিংবা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রেই অভিনয় করতে হয় তা নয়, এমনকি তাঁরা পারিশ্রমিকও কম পান। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, কোনো অভিনয়ের জন্য আগে নায়কদের নির্বাচন করা হয়, এরপর তাঁদেরই বলা হয়, তাঁরা যেন ঠিক করে দেন কোন নায়িকার সঙ্গে অভিনয় করতে চান। আর নায়িকারা আজকাল সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন না, কারণ এত ঝলমলে তারকা নায়িকাদের ভিড়ে পাছে না তাঁদের নিজেদের জায়গা বেদখল হয়ে যায়। এই যাত্রাপথ বড় বেশি বন্ধুর, একবার সুযোগ হাতছাড়া করলে তাঁদের স্থলে কাজ করার ভূরি ভূরি তারকা মুখিয়ে আছে।"[৩৫]

পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা যায়, পর্দায় কোনো নায়িকার আর্বিভাব পুরুষদৃষ্টি বিমোহিত করার জন্যে উপস্থাপিত হয় এমনটাই সাধারণত নির্দেশ করে। এ প্রেক্ষিতে মুম্বাইয়ের নারী অধিকার সংস্থা আকশারা সেন্টারের সমন্বয়ক স্নেহাল ভেলকার বলেন, "বলিউডে এমন কিছু গান আছে যা গাওয়া এবং নাচার জন্যে একেবারেই উপযুক্ত, কিন্তু যখন মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তখন লক্ষ করবেন, হয় একই শব্দের ভিন্ন কোনো লুকানো অর্থ রয়েছে কিংবা নারীদের উপজীব্য করা হয়েছে, নারীদের জন্যে যা অসম্মানজনক। এই সকল সংগীতে নারীদের হয়রানিকেও স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে, যা দৈনন্দিন জীবনে নারীদের প্রতি সহিংসতার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"[৩৬]

উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্রে পুরুষ আধিপত্যশীলতা নিয়ে শেলি ওয়ালিয়া বলেন, "যে কোনো চলচ্চিত্রে

---

[৩৩] *প্রিয়াংবদা, ভগবতী (২০১৪), 'দি ডার্ক সাইড অব বলিউড,' ইয়ুথ কি আওয়াজ, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2yMfC3x, *সর্বশেষ পঠিত: ১৫ এপ্রিল ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[৩৪] *শেলী, ওয়ালিয়া (২০১৪), 'দি ট্রু স্টোরি অব বলিউডস আন্ডারকভার ফিমেইল মেইকআপ আর্টিস্ট,' কোয়ার্টাস, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2zGksMx, *সর্বশেষ পঠিত: ১৬ এপ্রিল ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[৩৫] *ভাগ্যবতী, প্রিয়ামবদা (২০১৭), ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2yMfC3x, *সর্বশেষ পঠিত: ২ এপ্রিল ২০১৭।*

[৩৬] *মেইড অব মাইন্ডস, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2y7FgjF, *সর্বশেষ পঠিত: ৯ এপ্রিল ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

কর্মরত চিত্রগ্রাহক, স্পট বয় থেকে শুরু করে পরিচালক পর্যন্ত ৯০% হলেন পুরুষ। চলচ্চিত্রে যদি ২০০ জন কুশলী কাজ করেন তবে তাঁদের মধ্যে মাত্র ১২ অথবা ১৫ জন অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে থাকেন, আর খুব স্বল্প সংখ্যক জুনিয়র শিল্পী এবং নৃত্যশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। কেননা এখানে নারীদের বাধাগ্রস্ত করে রাখা হয়েছে।"[৩৭]

বলা যায়, সমাজের ভাবনা ও দৃষ্টিতে নারীর একটি বাঁধাধরা অবয়ব রয়েছে। সামনাসামনি যখন একজন নারীকে পুরুষ দেখে তখন সামাজিক বিধিনিষেধ ও সম্পর্কের কারণেই একটি সম্মানের জায়গা থাকে। কিন্তু যখন পর্দায় নারীকে দেখে তখন সে স্বাধীন। আর আমাদের প্রেক্ষাগৃহের বেশির ভাগ দর্শক যেহেতু পুরুষ, সেহেতু তাদের দৃষ্টিগত সুখের কথা চিন্তা করেই নারীর উপস্থাপন এমনভাবে করা হয় যেখানে নারীর শক্তিরূপের প্রকাশ ঘটে না। ভ্রমণকেন্দ্র হিসেবে তখন নারীর শারীরিক কাঠামোকেই বেছে নেওয়া হয়। তাই একজন নারী অভিনয়ের ক্ষেত্রে যতটুকু সুযোগ পান, নির্মাতা-সম্পাদক-চিত্রগ্রাহক-চিত্রনাট্যকার হিসেবে ততটা সুযোগ পান না।

বাংলাদেশের কাঠামোতে চলচ্চিত্র ও নারী

চলচ্চিত্রে নারীর অংশগ্রহণ

দেশে দেশে নারীর জীবনযাপন প্রায় অভিন্ন। সে অর্থে এ ভূখণ্ডেও নারীর চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট সুখকর নয়। ঢাকাই চলচ্চিত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বর্ণনার পূর্বে সমসাময়িক সামাজিক পটভূমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। উনিশ শতকে ঢাকা থিয়েটার সম্পর্কে মুনতাসীর মামুনের উদ্ধৃতি, "উনিশ শতকের শেষ দিকে ঢাকার মঞ্চনাটকে কলকাতা এবং ঢাকার মহিলাদের অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে রক্ষণশীলদের মধ্যে বিতর্কও চলে। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে আগত হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারে বেশ্যাদের অংশগ্রহণ নিয়ে পত্রপত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা হয়।"[৩৮]

অর্থাৎ, রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা নারীর অন্তঃপুরের বাইরে আগমণকেই মেনে নিতে পারে নি। এ বিষয়ে দেবী প্রসাদ ঘোষের বক্তব্য, "এক সময় আধুনিক জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ও আনন্দ পাওয়ার যে কোনো শিক্ষাকেই বাংলার মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল লোকেরা কুফুরি কাজ বলে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তার প্রথম ও প্রধান বাধা হয়েছে নারী। তাদের রঙ্গমঞ্চে বা চলচ্চিত্রে অভিনয় করা দূরে থাক, নাটক বা চলচ্চিত্রে দেখাও পাপ কাজ বলে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।"[৩৯]

তথ্যসাপেক্ষে বলা যায়, প্রথাগত কারণেই উপমহাদেশের কলকাতা এবং মুম্বাইয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হলেও ঢাকায় প্রায় তিন দশক লেগে গিয়েছিল শুরু হতে। উল্লেখ্য, তখন এ অঞ্চলে নারীদের মঞ্চে অভিনয় করার চল ছিল না। তাই সুকুমারী চলচ্চিত্রে পুরুষরাই নারীর বেশে অভিনয়

---

[৩৭] *শেলী, ওয়ালিয়া (২০১৪), 'দি ট্রু স্টোরি অব বলিউডস আন্ডারকভার ফিমেইল মেইকআপ আর্টিস্ট,' কোয়ার্টাস ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2zGksMx, *সর্বশেষ পঠিত: ১৩ এপ্রিল ২০১৭।*

[৩৮] *উদ্ধৃত মামুন, মুনতাসীর (১৯৭৯), উনিশ শতকের ঢাকার থিয়েটার, পৃ. ৬৩।*

[৩৯] *ঘোষ, দেবী (২০০৯), অভিনেত্রী কথা, কলকাতা: সায়নী প্রকাশনী, পৃ. ৬৩।*

করেন। চলচ্চিত্র গবেষক হায়াৎ অনুপম বলেন, "১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্যরা সুকুমারী নামের যে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তাতে নায়ক চরিত্রে পুরুষ পাওয়া গেলেও নায়িকা চরিত্রে কোনো নারীকে পাওয়া যায়নি। ফলে আব্দুস সোবহান নামের এক তরুণ নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেন।"[৪০]

'সুকুমারী'র সাফল্যের পর, ১৯৩১ সালে নওয়াব পরিবারের উদ্যোক্তারা নির্মাণ করেন 'দি লাস্ট কিস (শেষ চুম্বন) নামে একটি নির্বাক পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র। চলচ্চিত্র গবেষক গীতি আরা নাসরীন ও ফাহমিদুল হক 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প : সংকটে জনসংস্কৃতি' গবেষণা গ্রন্থে 'সুকুমারী' ও 'দি লাস্ট কিস' চলচ্চিত্র নারীর নির্মাণরূপ সম্পর্কে বলেন, "দুটি ছবির ক্ষেত্রেই নারী চরিত্র নিয়ে সাধারণ একটি পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা যায়, যেটি হলো চলচ্চিত্র অভিনয়ের জন্য তখন কোনো অভিনেত্রী পাওয়া যায়নি। কলকাতার অভিজ্ঞতায় যেমন প্রথম দিকে নায়িকা হিসেবে দেখা গিয়েছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের, বাঙালি মেয়েরা ছবিতে অভিনয় করেনি, এক্ষেত্রেও সমাজের রক্ষণশীলতার কারণে মেয়েরা সিনেমায় নামতে চায়নি। প্রথমটিতে কেন্দ্রীয় নারীচরিত্রে অভিনয় করেন একজন পুরুষ, সৈয়দ আবদুস সুবাহান। আর দ্বিতীয়টিতে দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন ঢাকার পতিতাপল্লীর দুই মেয়ে ললিটা ও চারুবালা।"[৪১]

ধর্মীয় ও সামাজিক রক্ষণশীলতার জন্যে নারীর চলচ্চিত্রে প্রবেশ যখন নানাভাবে বাধাগ্রস্ত, এমন একটি সময়ে আগমণ ঘটে একজন নবীন নারী অভিনয়শিল্পীর। এ প্রসঙ্গে চলচ্চিত্র সমালোচক ও গবেষক চিন্ময় মুৎসুদ্দী বলেন, "১৯৪৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মুক্তি পায় বিভূতিদাস পরিচালিত ছবি তপোভঙ্গ। এই ছবিতে বনানী চৌধুরী নামে একজন অভিনেত্রী অভিনয় করেন। তাঁর আসল নাম বেগম আনোয়ারা, বাড়ি মাগুরায়। বনানী উপমহাদেশের প্রথম বিএ পাস মুসলিম অভিনেত্রী। তাঁকেও ছদ্মনাম ধারণ করতে হয়।"[৪২] লক্ষণীয়, রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় নারীকে ছদ্মনাম ধারণ করে চলচ্চিত্রে আসতে হয়। নারীর অভিনয় করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় সমর্থন না থাকায় এ সময়ে অনেককেই ছদ্মনাম ধারণ করতে দেখা যায়।

দেশভাগের পরবর্তীকালে ঢাকায় নতুন করে সংস্কৃতিচর্চা শুরু হয়। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। ১৯৫৬ সালে এ অঞ্চলে প্রথম নির্মিত হয় পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'। এই চলচ্চিত্রে সর্বপ্রথম নারীকে পেশাদার অভিনয়শিল্পী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এই চলচ্চিত্রে প্রায় সাতজন নারী– পূর্ণিমা সেন, নাজমা বেগম, জহরত আরা, রহিমা, ফাইজা, বিলকিস বারী ও খালেদা– অভিনয় করেন। চলচ্চিত্র লেখক মাসুদ পারভেজ বলেন, "১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে 'রঙ্গনাট্য' দলে এসে যোগ দেন পূর্ণিমা। ১৯৫৪ সালে তিনি 'মুখ ও মুখোশ' সিনেমায় অভিনেত্রী হিসেবে আসেন। পূর্ণিমা সেন ছাড়াও এ চলচ্চিত্রে দুই সহনায়িকা চরিত্রে নির্বাচিত হন জহরত আরা ও নাজমা (পিয়ারী বেগম)। জহরত আরা ও নাজমা দুই বান্ধবী

---

[৪০] *হায়াৎ, অনুপম (২০১৩), গণমাধ্যম ও নারী, ঢাকা: সমাচার প্রকাশনী, পৃ. ৪৬।*

[৪১] *নাসরীন, গীতি আরা ও হক, ফাহমিদুল (২০০৮), বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প: সংকটে জনসংস্কৃতি, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, পৃ. ৩৫।*

[৪২] *মুৎসুদ্দী, চিন্ময় (১৯৮৭), বাংলাদেশের সামাজিক অঙ্গীকার, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।*

এবং ইডেন কলেজে পড়তেন। পিয়ারী বেগম তাঁর চলচ্চিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে বলেন : 'মুখ ও মুখোশ'-এ অভিনয় করার সময় আমি ইডেন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। বাবা কিছুতেই অভিনয় করতে দিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু জব্বার সাহেবের অনুরোধেই আসলে বাবা অনুমতি দিলেন।"[৪৩]

প্রেক্ষাপটের আলোকে বলা যায়, এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীর যাত্রা-সংগ্রাম যথেষ্ট সহজতর ছিল না। এমন একটি প্রেক্ষাপটে 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্রে একসঙ্গে এতজন নারীর অভিনয় করা এদেশে নারী বিপ্লবের এক দৃষ্টান্ত। শুধু অভিনয় নয়। অনুপম হায়াৎ বলেন, "এই চলচ্চিত্রেই প্রথমবারের মতো কোন নারী সংগীত শিল্পী গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। তাঁর নাম মাহবুবা হাসনাম।"[৪৪]

'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্রের দুইবছর পর ঢাকায় নির্মিত হয় 'আসিয়া' (১৯৬০) চলচ্চিত্রটি। আগমন ঘটে সুমিতা দেবী নামে একজন নব অভিনয়শিল্পীর। অব্যয় রহমানের উক্তি থেকে জানা যায়, "এফডিসি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম নায়িকা হিসেবে আবির্ভূত হন সুমিতা দেবী। তাঁর আসল নাম হেনা ভট্টাচার্য।"[৪৫]

সার্বিকভাবে, সুমিতা দেবীর চলচ্চিত্রে আগমন পরবর্তীকালে অন্যান্য নারীকে চলচ্চিত্রে আসার জন্যে উৎসাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রেরণা জোগায়। সমসাময়িক ঢাকার চলচ্চিত্রে নায়িকা হয়ে আসেন ডা. রৌশনারা, সুলতানা জামান, আনোয়ারা, রানী সরকার, কবরী, সুচন্দা, সুজাতা, শাবানা প্রমুখ। বিশ্ব চলচ্চিত্রের সূচনালগ্নে এক বছরের ব্যবধানে নারী নির্মাতা পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।

পার্শ্ববর্তী ভারতের চলচ্চিত্রেও খুব অল্প সময়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা নির্মাণে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের একজন নারী নির্মাতা পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় সত্তর বছর। 'গণমাধ্যম ও নারী' গ্রন্থে অনুপম হায়াৎ বলেন, "তৎকালীন পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মীয় ও সামাজিক বৃত্ত ভেঙে এবং পুরুষশাসিত চিত্রজগতে 'বিন্দু থেকে বৃত্ত' নির্মাণ করে মহিলা পরিচালক হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন রেবেকা।"[৪৬]

পর্যায়ক্রমিক চলচ্চিত্র প্রেক্ষাপটে, রক্ষণশীলতার চক্রচ্যুহ ভেদ করে নারী অভিনয়শিল্পী পরিচয়ে যতটুকু স্থান করে নিতে পেরেছেন, নির্মাতা পরিচয়ে ততটা পারেন নি। যাঁরা নির্মাতা পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদের চলার পথও মসৃণ নয়। নারী কেবল অভিনয়ে মানানসই, সাধারণত এই বোধ আঁকড়ে বসে আছেন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টজনরাও। অভিনয় ব্যতীত পরিচালনা, সম্পাদনা, চিত্রধারণে নারী অসমর্থ, কেউ শখের বসে এলেও সেটা ফ্যান্টাসি ছাড়া কিছু নয় বলেই মনে করা এবং প্রমাণ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ফলস্বরূপ, নারী গৃহ-আঙ্গিনার সীমানা পার হয়ে যদিও বা চলচ্চিত্র আঙিনায় পৌঁছাতে পারে কিন্তু শেষরক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। নারী প্রসঙ্গে,

---

[৪৩] *পারভেজ, মাসুদ (২০১৬), 'কুশীলবের খোঁজে,' পরস্পর, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2zS2CqG, *সর্বশেষ পঠিত: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ।*

[৪৪] *হায়াৎ, অনুপম (২০১৩), গণমাধ্যম ও নারী, ঢাকা: সমাচার প্রকাশনী, পৃ. ৭২।*

[৪৫] *রহমান, অব্যয় (২০০৯), সুমিতা দেবী, ঢাকা: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, পৃ. ১৫।*

[৪৬] *হায়াৎ, অনুপম (২০১৩), গণমাধ্যম ও নারী, ঢাকা: সমাচার প্রকাশনী, পৃ. ৪৪।*

সংশ্লিষ্টজনদের মধ্য থেকে উৎসাহের চেয়ে নিরুৎসাহিত হওয়ার প্রবণতাই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন

"ঢাকার চলচ্চিত্রের পর্দায় উপস্থাপিত নারী চরিত্রের প্রায় সবাই পতিপ্রাণ সতী, এদের স্থান গৃহে, এদের অন্য কোনো পেশা নেই, এরা যৌন আর্কষণের কেন্দ্রবিন্দু, এরা পূজনীয় মাতৃত্বরূপে অধিষ্ঠিত, নারীরাই নারীর শত্রু, এরা হত্যা-ধর্ষণ ইত্যাদি সহিংসতার শিকার ও এক্সট্রা চরিত্রগুলো (ভ্যামরা নর্তকী, সহবরীরা) যৌনতা সর্বস্ব।"[৪৭]

শেখ মাহমুদা সুলতানার লেখার নিরিখে বলা যায়, সর্বজনীন ক্ষেত্রে বলা যায়, নারীমাত্রই সর্বংসহা, মমতাময়ী. ধৈর্যশীলা, গৃহের শোভা, পুরুষ-চক্ষুর মনোরঞ্জনের উপাদান– এই বিশেষণসমূহ পরম্পরায় শুনে শুনে নারী-পুরুষ উভয়ের মননে ও মজ্জায় এক আবহ সৃষ্টি হয়েছে। যে আবহরূপ চলচ্চিত্রে বিরাজমান।

গবেষক কাবেরী গায়েন বলেন, "নারীকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রধান ধারা দেখা যায়। প্রথমত, সতীসাধ্বী নায়িকা যিনি প্রথমে নায়কের প্রেমিকা, তারপর স্ত্রী। দ্বিতীয়ত, মা চরিত্র। তৃতীয়ত, নায়ক বা নায়িকার ভাবী, বোন জাতীয় পার্শ্বচরিত্র। চতুর্থত, ভ্যাম্প চরিত্র। পঞ্চমত, সহকারী বা অতিরিক্ত চরিত্র। দেশে গত দুই দশকে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবদান এবং নতুনভাবে আত্মপ্রকাশের সাথে সংগতিপূর্ণ কোনো চরিত্রে তাঁদের দেখা যায় না।"[৪৮]

সাধারণ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা যায় যে, চলচ্চিত্রের পর্দায় নারীর উপস্থাপন দর্শকের সন্তুষ্টি মেটাতে অক্ষম হলে চলচ্চিত্র-পুঁজিপতিরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দর্শক শ্রেণির বিপুল অংশ পুরুষ। তাই পুরুষের মনোরঞ্জনে নারীকেই বেছে নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে শবনম আযীম বলেন, "যখন থেকে চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী এ মাধ্যমের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে অর্থনীতি ও ব্যবসা, তখন থেকেই চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে ভোগ্যপণ্য আর প্রায়শই এ শিল্পভাষা হারিয়ে বসে তার প্রকৃত রূপ। ভোক্তাকুলের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য নির্মাণে উদ্যোগী হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রনির্মাতা, কুশলী, অর্থ বিনিয়োগকারী প্রমুখ। সকলেরই লক্ষ একটিই দর্শককে খাওয়ানো।"[৪৯]

নারীর পর্দায় উপস্থাপনের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে শিক্ষক ও গবেষক গীতি আরা নাসরীনের লেখায়। তিনি বলেন, "বিশেষত এই উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্রে পপুলার নায়ককে দেখা যায় নীতির প্রশ্নে যুধিষ্ঠির, অস্ত্র-দক্ষতায় অর্জুন, বাহুবলে ভীম, রমণীমোহনে কৃষ্ণ, চেহারায় কন্দর্প, নৃত্যগীতে গন্ধর্ব। যে পুরুষোত্তমকে পৌরাণিক কাহিনিও নির্মাণ করতে পারেনি, প্রযুক্তি ব্যবহারে জনপ্রিয় সিনেমা সেই এক নায়ককে সর্বগুণে সমন্বিত করতে পারে। এই নায়কনির্ভর নির্মাণ থেকে

---

[৪৭] *সুলতানা, শেখ মাহমুদা (২০০২), 'ঢাকার চলচ্চিত্র ও নারী: মানব, দেবতা ও পতির রাজ্যে-নষ্টা, এক্সট্রা ও সতী,' গীতি আরা নাসরীন প্রমুখ সম্পাদিত গণমাধ্যম ও জনসমাজ, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, পৃ. ১৯৮-২০৪।*

[৪৮] *গায়েন, কাবেরী (২০১৭), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ১১ এপ্রিল, ২০১৭।*

[৪৯] *আযীম, শবনম (২০১৪), 'বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রে পছন্দের উপাদান নির্ধারণ: দর্শকের দৃষ্টিকোণ,' কলা অনুষদ পত্রিকা, পৃ. ৩৩৪।*

বাংলাদেশের ফর্মূলা ফিল্ম কখনো বেরিয়ে আসেনি।"[৫০]

বলা যায়, চলচ্চিত্রজুড়ে নায়কের গুণকীর্তন এতই প্রকট যে নায়িকার সেখানে রাধা হওয়া ছাড়া আর কোনো সুযোগ নেই। নায়কের শক্তি প্রমাণে নায়িকা যতদুর্বলভাবে উপস্থাপিত হবে নির্দিষ্ট দর্শক ততই বিনোদিত হবে। ফৌজিয়া খান 'চলচ্চিত্রে নারীবাদ' প্রবন্ধে বলেছেন, "চলচ্চিত্রের বর্ণনায় পুরুষের চরিত্ররা চোখ রাখে নারীদের দিকে। পুরুষ চরিত্রের কামজ দৃষ্টিকোণে দৃশ্যায়িত চলচ্চিত্র মিলনায়তনে দর্শককে এই পুরুষ ছবির সাথেই একাত্ম করে তোলে। ক্যামেরার প্রেক্ষণ বিন্দু, চরিত্রায়ণ এবং দৃশ্যায়নের কলাকৌশল চলচ্চিত্রের নারী চরিত্রগুলোকে দেখবার জিনিস হিসেবে উপস্থাপন করে।"[৫১]

সাহিত্য পর্যালোচনার নিরিখে বলা যায়, প্রথার বাইরে আজো যেতে পারে নি চলচ্চিত্র। সংগ্রাম ও সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম হয়ে ওঠা সত্ত্বেও নারীর অংশগ্রহণ আজো বিতর্কিত। প্রথার বাইরে এই গণমাধ্যম নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে পারে নি। শুরু থেকে এ যাবৎ বাংলাদেশে নির্মিত প্রায় হাজারতিনেক পূর্ণদৈর্ঘ্য বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের মধ্যে নারী উপস্থিতি লক্ষ করবার মতো। কিন্তু চলচ্চিত্রের সংখ্যা এবং পর্দায় প্রতিফলিত সময়ের ব্যাপ্তিতে নারীর অবস্থান ইতিবাচক হলেও বর্ণিত সংখ্যা কিংবা ব্যাপ্তির মধ্যে নারীর যে ইমেজ চিত্রিত হয়েছে তার ইতিবাচক দিক নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এ সকল চলচ্চিত্রের অধিকাংশেই পুরুষের প্রাধান্য এবং মূলত পুরুষের প্রেম ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় নারীর অবস্থান থেকে অবস্থানান্তর ঘটে।

চলচ্চিত্র ও 'এক্সট্রা' বা সহকারী নারী অভিনয়শিল্পী

"মাসের পয়লা তারিখ। হাতে ফর্দ ঝুলিয়ে আপনি ঢুকলেন শহরের কোনো বড় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাজারে। এটা, ওটা, সেটা দেখার পর হঠাৎই অভিনব আবিষ্কার, আপনার নিত্য পরিচিত ডিটারজেন্টের সাথে ২৫ শতাংশ 'এক্সট্রা'। সঙ্গে সঙ্গে বড়োসড়ো হাসি আপনার ঠোঁটে। হালফিলের জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনী স্লোগানও বলছে 'এক্সট্রা' পেলে সবসময়ই দিল খুশ। কথাটা হয়ত পরিচালকদের ক্ষেত্রেও ষোলো আনা খাঁটি। কীভাবে? এই যেমন ধরুন চিত্রনাট্যের খাতিরে তৈরি করতে হবে জনতার দৃশ্য। কিংবা নায়কের চরিত্র জোরদার করতে দরকার ছিঁচকে গুন্ডার। বা নায়িকার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে নাচার জন্য প্রয়োজন পড়ল নর্তকীর। পরিচালকদের এমন সব প্রয়োজনে মুশকিল আসান হিসেবে যাঁরা পর্দায় আসেন, ইন্ডাস্ট্রির ভাষায় তাঁরাই 'এক্সট্রা'। সময়ের বদলে অবশ্য বদলেছে এঁদের পরিচিতি। তাই এঁরা এখন 'জুনিয়র আর্টিস্ট'। কিন্তু প্রশ্নটা ওই 'নাম মে ক্যয়া রাখ্খা হ্যায়?' পরিচিতি বদলানোয় তাঁদের পরিস্থিতি বদলেছে কী?"[৫২]

এখন হলিউড, বলিউড, ঢালিউডের চলচ্চিত্রে এক্সট্রা বা সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের অবস্থা ও

---

[৫০] *নাসরীন, গীতি আরা (২০১২), 'ভাবপ্রবণ থেকে উন্মাদ: রুপালি পর্দা-নায়কের বিবর্তন', মাহমুদুল হোসেন সম্পাদিত সম্পাদিত, দৃশ্যরূপ, ঢাকা।*

[৫১] *খান, ফৌজিয়া (২০০৬), 'চলচ্চিত্রে নারীবাদ,' মাহমুদুল হোসেন সম্পাদিত, দৃশ্যরূপ, পৃ. ৬৬-৬৭।*

[৫২] *মজুমদার, পায়েল (২০১৩), 'উজ্জ্বল ছবি অচেনা মুখ,' আনন্দবাজার পত্রিকা, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2yOAE1G, *সর্বশেষ পঠিত: ৬ জানুয়ারি ২০১৭।*

অবস্থানের চিত্রে কি কোনো ভিন্নতা রয়েছে? না দেশে-দেশে এই স্তরের অভিনয়শিল্পীদের অবস্থার চিত্র বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

হলিউডের সহকারী নারী অভিনয়শিল্পী

জীবনকাহিনির বাস্তব রূপদানে, কেন্দ্রীয় চরিত্রের বাইরে অসংখ্য চরিত্রের রূপদান প্রয়োজন হয়। কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে মুখ্য করে উপস্থাপনের জন্যে প্রয়োজন হয় গৌণ ভূমিকার। কাহিনিকে বাস্তবমুখী করায় এর বিকল্প নেই। বিখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক রিচার্ড জনসন লাইফ অ্যাজ এ ফিল্ম এক্সট্রা: হলিউড'স লিস্ট পাওয়ারফুল প্রবন্ধে বলেন "এক্সট্রাদের আর এক্সট্রা বলে ডাকা হয় না, এখন তাঁরা 'সহযোগী শিল্পী'। আর, নিশ্চয়ই এঁরা যদি না থাকত, তাহলে কোনো চলচ্চিত্রকে অনেকটা তরল মনে হতো। কিন্তু তাঁদের 'শিল্পদক্ষতা' শুরু ও শেষ হয় হাঁটাচলা, দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা বসে থাকার মধ্য দিয়ে। এ কারণে প্রায়ই তাঁদের 'আবহ', 'পরিবেশ', কিংবা 'সেট ড্রেসিং' বলেও আখ্যা দেওয়া হয়। এঁরা যেন মাংসল আসবাবপত্র। তাঁদের এ কাজ যেন খুব একটা শ্রদ্ধার দাবি রাখে না।"[৫৩]

বলা যায়, চলচ্চিত্রে তাঁদের প্রতিচিত্র অত্যন্ত অবমাননাকর ফলে চলচ্চিত্রের প্রান্তিক অস্তিত্ব রূপেই তাঁদের গণ্য করা হয়। শ্রদ্ধা প্রাপ্তি সচরাচর ঘটে না তাঁদের জীবনে।

হলিউডে প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ জুনিয়র শিল্পী হিসেবে কাজ করছেন হ্যারল্ড গ্রিন। নিজের কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, "যা আমাদের পক্ষে সর্বোচ্চ করা সম্ভব, আমরা হয়ত তাই করছি। খুব বাজেভাবে বলতে গেলে আসলে তা কিছুই নয়। এটা প্রায় অশ্লীলতার মতো, একবার তুমি শুরু করলে আর থামাতে পারবে না।"[৫৪] গ্রিনের সহকর্মী কারবি বলেন,"এটি দক্ষ জনগোষ্ঠীর অদক্ষ শ্রম।"[৫৫]

হলিউডে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরুর এক দশক পর ১৯২৩ সালে লস এঞ্জেলস টাইমস-এ লিখেছিলেন, "চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় প্রত্যেক মাসে ১০,০০০ এর অধিক তরুণ এবং তরুণী তাদের আইনি বয়সের থেকেও কম বয়সে এই শহরে আসে, ছবিতে কাজ করার জন্য। অবশ্যই অতি অল্পজনের মধ্যে সেরকম প্রতিভা থাকে, কিংবা প্রতিভা থাকলেও অতি অল্পজনেরই সৌভাগ্য হয় ছবিতে জায়গা করে নেবার।... ১৯২৫ সালে অধুনালুপ্ত লস এঞ্জেলেস টাইমস-এর তথ্য অনুযায়ী ৪০,০০০ জন ছিলেন নেপথ্য অভিনেতা, যাদের দেখা যেত বাইবেলের এপিক কোনো কাজে বিশাল ভিড়ের মধ্যে বা পশ্চিমাদের মধ্যে ঘোড়ায় চড়তে বা এরকম কোনো কিছু।"[৫৬]

জো কেলি তাঁর দ্যা ট্রুথ এবাউট বিং অ্যান্ড এক্সট্রা হাউ টু বিকাম এ গুড ব্যাকগ্রাউন্ড এক্টর বইয়ে বলেছেন "একটি চলচ্চিত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড অভিনয়শিল্পী, এক্সট্রা নির্বাচন নির্ভর করে প্রোডাকশনের

---

[৫৩] *রিচার্ড, জনসন (২০০৯), 'লাইফ অ্যাজ এ ফিল্ম এক্সট্রাস: হলিউডস লিস্ট পাওয়ারফুল,' দি টেলিগ্রাফ, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2yMMuJF, *সর্বশেষ পঠিত: ৬ মার্চ ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[৫৪] *জন, থান অ্যা (২০১৫), 'হোয়াই ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সট্রাস আর সো ইমপরটেন্ট,' প্রজেক্ট কাস্টিং, ওয়েবসাইট:* https://goo.gl/Dj4dF1, *সর্বশেষ পঠিত: ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[৫৫] *প্রাগুক্ত*

[৫৬] *প্রাগুক্ত, সর্বশেষ পঠিত: ৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ।*

ওপর। অনেক সময় এক্সট্রাদের সামান্য কিছু অভিনয় জানা থাকলেও হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ হলেও চলে, তবে সবক্ষেত্রে এটি সত্য নাও হতে পারে। যে কোনো পরাবাস্তব দৃশ্যের ক্ষেত্রে এক্সট্রাদের অবশ্যই কল্পনাশক্তি ও অভিনয় দক্ষতা লাগবে। সাধারণত খুব অল্প সময়ের নোটিশে এক্সট্রাদের নির্বাচন করা হয়।"[৫৭]

"একটি দৃশ্যকে জীবন্ত করে উপস্থাপনের জন্যে এক্সট্রাদের প্রয়োজন রয়েছে। যাই হোক, প্রায়ই প্রযোজক, কাস্টিং উৎপাদক এবং পরিচালকরা এই এক্সট্রা শিল্পীদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করেন।"[৫৮]

হলিউডে এক্সট্রা বা জুনিয়রদের মধ্যে অনেক নারী কাজ করেন। দেলহেন্ট একজন নারী জুনিয়র অভিনেত্রী। কাজ করছেন প্রায় এক দশক যাবৎ। বিভিন্ন চলচ্চিত্র, টিভি সিরিজ ও বিজ্ঞাপনে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কাজের প্রয়োজনে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। তিনি বলেন, "এ এক কঠিন লড়াই, যেখানে ভিড় করে আছে উন্নত বক্ষ আর উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের নারীরা, যাঁরা একজনের চেয়ে আরেকজন কিছুতেই কম নয়, সবাই প্রায় একই রকম। আর আছে বাদামি চুলের সুন্দরীরা। এখানে টিকে থাকা সত্যি কঠিন। আমি মনে করি, মাঝে মধ্যে তুমি ওই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে পার, কিংবা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছ বলে অনুভব করতে পার, এবং স্রেফ তলিয়ে যেতে পার।"[৫৯]

সিয়েরা জো থম্পসন-এর ভাষায়, "প্রায়শই আমরা কুকুরের মতো ব্যবহার পাই। অনেক ক্রু সদস্য এমন রসিকতা করে যেন এক্সট্রা কোনো খাবার সামগ্রী বা তামাশার পাত্র।"[৬০]

সমগ্র বিশ্বেই সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীরা গড়পরতায় নিপীড়িত। পুঁজি এবং পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থায় এই নারীরা খুব সহজেই যৌনবস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফ্রাঙ্কি শা ২০১৫ সালে সানডেন উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে জুরি পুরস্কার বিজয়ী একজন নারীনির্মাতা ও অভিনেত্রী। 'এক্সট্রা' বা সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের প্রতি ইন্ডাস্ট্রির পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "নির্দিষ্ট কিছু শো তে নির্মাতা, লেখক এবং প্রযোজকরা সৃজনশীল নবীন এক্সট্রাদের ফাঁদে ফেলেন। তাঁরা প্রকৃতই দেখতে ভালো এক্সট্রাদের বিষয়ে বেশি আগ্রহী থাকেন। এই এক্সট্রারা স্যামন মাছের মতো শিকারে পরিণত হন, স্যামন মাছের মতো এরকম শিকারের মুখোমুখি হন।"[৬১]

---

[৫৭] *জো, ক্যালি (২০০৬). 'দি ট্রুথ অ্যাবাউট বিং অ্যান্ড এক্সট্রা: হাউ টু বিকাম এ গুড ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাক্টর,' লস অ্যাঞ্জেল: ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাক্টর সেমিনার, পেইজ ৬; অনুবাদ গবেষকের।*

[৫৮] *জন, থান অ্যা (২০১৫), 'হোয়াই ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সট্রাস আর সো ইমপরটেন্ট', প্রজেক্ট কাস্টিং, ওয়েবসাইট:* https://goo.gl/Dj4dF1, *সর্বশেষ পঠিত: ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[৫৯] *এস্কোনি, স্লাইড (২০১২), 'হলিউড আননোনস এ হিস্ট্রি অব এক্সট্রাস, বিট প্লেয়ারস অ্যান্ড স্ট্যান্ড ইন,' ইউনিভার্সিটি প্রেস অব মিসিসিপি, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2iBWK0X, *সর্বশেষ পঠিত: ৫ এপ্রিল ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[৬০] *হিল্লেল, অ্যারন (২০১৫), 'সাম হলিউড এক্সট্রা সাফার, বাট আদার আর রুলিং ইট', লা. উইকলি নিউজ লেটারস, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/1vlIMju, *সর্বশেষ পঠিত: ২ মার্চ ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[৬১] *এস্কোনি, স্লাইড (২০১২), 'হলিউড আননোনস এ হিস্ট্রি অব এক্সট্রাস, বিট প্লেয়ারস অ্যান্ড স্ট্যান্ড ইন,' ইউনিভার্সিটি প্রেস অব মিসিসিপি, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2iBWK0X, *সর্বশেষ পঠিত: ৫ এপ্রিল ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

প্রসঙ্গালাপে সহকারী নারী অভিনেত্রী নাদিন ওয়েন্ডেল-মজিকার উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "কিছু কিছু ক্রু মেম্বার এক্সট্রাদের অযাচিতভাবে আঘাত করে কিংবা শোয়ার প্রস্তাব দেন। অনেক প্রযোজক অপ্রয়োজনে সুন্দরী নারী এক্সট্রা নির্বাচন করতে চান।"[৬২]

"আমরা মানুষ নই, আমরা সত্যি একজন এক্সট্রা... আমি এবং অন্য আরো কিছু এক্সট্রা সকাল ৫:৩০ মিনিটে সেটে পৌঁছাই। আমাদের পাশেই ক্রু মেম্বাররা কফি খাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের নেই। আমাদের প্রতি দুজনের জন্য এক বোতল পানি।"[৬৩] এ প্রসঙ্গে গবেষক হিলস অ্যারন বলেন, "যে কোনো ফিল্ম সেট অনেক ক্ষেত্রে নির্মমভাবে উচ্চপদ থেকে নিম্নপদ কাঠামোর হতে পারে। তাই এটি অন্তরালের শিল্পী, সংক্ষিপ্ত অভিনয়শিল্পীদের জন্যে আশ্চর্যজনক কিছু যে তাঁরা মূল শিল্পী ও কারিগরি ক্রুদের তুলনায় ভিন্ন মানের খাবার পেয়ে থাকেন।"[৬৪]

এই শিল্পীদের প্রতি চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টজন এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অতিশয় বিস্ময়কর। উচ্চ-নিম্নের তৎপরতায় আড়ালে পড়ে এই শিল্পীদের শিল্পীসত্তা। এঁরা শিল্পী হিসেবে সমাদৃত হন না। উপেক্ষা-অবহেলায় গভীর এক হীনম্মন্যতায় ভোগেন। এই হীনম্মন্যতায় নিজেরা নিজেদের প্রতিভার আত্মোপলব্ধি করতে পারেন না। অথচ, চলচ্চিত্রের জন্যে দিনরাত পরিশ্রম করে যান। এক্সট্রা এজেন্সি এক্টিং ইন লন্ডনে প্রকাশিত তথ্যমতে, "একজন অতিরিক্ত শিল্পী হিসেবে চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করা সহজ নয়। একজন এক্সট্রা শিল্পীকে দিনের দশ থেকে বারো ঘণ্টা কাজ করতে হয়। কখনো কখনো এক্সট্রা শিল্পীকে ১৮ ঘণ্টার জন্যে আটকে যেতে হয়। একজন এক্সট্রা শিল্পীর মজুরি অত্যন্ত নগণ্য। সাধারণত দুইভাবে এই মজুরি নির্ধারিত হয়। কদাচিৎ ঘণ্টা হিসেবে, সাধারণত দিন হিসেবে তাদের বেতন দেওয়া হয়। কেউ অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্যে মূল্য দিতে চায় না। তাই তাঁরা একদরে মজুরি প্রদান করে থাকে। সাধারণত, দিন হিসেবে দেওয়া হয়। এই মজুরি ১০০ ইউরো এবং ১০০ থেকে ১৫০ মার্কিন ডলার হয়ে থাকে।"[৬৫]

এই দৈন্য কাটিয়ে ওঠবার জন্যে "১৯৪১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে র‍্যাডিক্যাল ইউনিয়ন অতিরিক্তদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফল হতে পারে নি। কেন্দ্রীয় চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে অতিরিক্তরা (এক্সট্রা) মোটামুটি ভালো ব্যবহার ও ভালো বেতন পেতে শুরু করে। যদিও ১৯৪১ সালে এক্সট্রা গিল্ড সৃষ্টির আগ পর্যন্ত এই সুবিধাদি ছিল না। ১৯৯২ সালে এক্সট্রারা তাঁদের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার এবং তাঁদের আত্মীকরণ করার জন্য প্রভাবশালী স্ক্রিন গিল্ড অভিনেতাদের বোঝাতে সক্ষম হন।"[৬৬]

---

[৬২] *হিল্লেল, অ্যারন (২০১৫), 'সাম হলিউড এক্সট্রা সাফার, বাট আদার আর রুলিং ইট', লা. উইকলি নিউজ লেটারস, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/1vlIMj, *সর্বশেষ পঠিত: ২ মার্চ ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[৬৩] *প্রাগুক্ত।*

[৬৪] *সাগ আফট্রা, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2yT5k18, *সর্বশেষ পঠিত: ৪ এপ্রিল ২০১৭।*

[৬৫] *হিল্লেল, অ্যারন (২০১৫), 'সাম হলিউড এক্সট্রা সাফার, বাট আদার আর রুলিং ইট', এল.এ উইকলি নিউজ লেটারস, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/1vlIMj, *সর্বশেষ পঠিত: ২ মার্চ ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[৬৬] *হিল্লেল, অ্যারন (২০১৫), 'সাম হলিউড এক্সট্রা সাফার, বাট আদার আর রুলিং ইট', এল.এ উইকলি নিউজ লেটারস, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/1vlIMju, *সর্বশেষ পঠিত: ২ মার্চ ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

ফলস্বরূপ, ইউনিয়নভুক্ত সহকারী শিল্পীদের উপার্জনে পরিবর্তন দেখা দেয়। ইউনিয়নভুক্ত হওয়ায় সহকারী শিল্পীদের আয় পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। "১৯২০ সালে একজন এক্সট্রা চলচ্চিত্রে কাজ করে দৈনিক ২ ডলার আয় করতেন। বর্তমানে একজন ইউনিয়নভুক্ত এক্সট্রা সারা বছরে প্রায় দৈনিক ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা করে ১০০ থেকে ১৭০ দিন কাজ করে প্রায় চল্লিশ হাজার ডলার থেকে এক লাখ সত্তর হাজার ডলার পর্যন্ত আয় করেন।"[৬৭]

বলিউডের সহকারী নারী অভিনয়শিল্পী

জুনিয়র আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদর দপ্তর এখন নিষ্প্রাণ, বোম্বের কেন্দ্রীয় অফিসটিতে বলিউডের স্বপ্ন মাঠে মারা যাচ্ছে। এখানে, ফিল্ম এক্সট্রাদের এই ইউনিয়নের মোট সদস্য সংখ্যা ৭৫০। এঁদের সবারই এক সময় বড় সাধ ছিল তারকা হওয়ার। এই আশায় গোটা ভারত থেকে এখানে এসে জড়ো হয়েছে। কিন্তু বছরের পর বছর অডিশন দিয়ে বারবার প্রত্যাখাত হতে হতে, শেষমেশ এক্সট্রাদের খাতায় নাম লিখিয়েছে। কোনো গানের নেপথ্যে জটলা আকারে, কিংবা কোনো রাস্তার দৃশ্যে যেখানে মুখশ্রীর কোনো গুরুত্ব নেই, সেখানে জনস্রোতের মধ্যে রয়ে গেছে। এক্সট্রারা, যদি কাজ পায়, তাহলে দিনে বড়জোর সাত ডলার কামাই করে। (আর বলিউডের সবচেয়ে নামিদামি তারকারা প্রতিটি সিনেমার জন্য পায় অন্তত ১০ লাখ ডলার)। এঁরা অবর্ণনীয় কষ্ট করে– ফুটপাতে ঘুমায়, কতদিন না খেয়ে থাকে, নানান রোগ শোকে ভোগে– তবু পরাজিতের ন্যায় ফিরে যায় না নিজ গ্রামে। এত কষ্টের পরও, এঁরা জুনিয়র আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিতে মোটা অঙ্কের ফি দেয়।[৬৮]

বলা যেতে পারে, সমগ্র পৃথিবীতেই সহকারী শিল্পীদের জীবন-সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি প্রায় এক। স্বপ্নপ্রবণ মানব যখন প্রত্যাখ্যাত হয় চলচ্চিত্রে এসে তখন আর ফিরে যেতে চায় না। পরাজিত জীবনকে লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় অবর্ণনীয় কষ্ট করে যায়। অপেক্ষা করে চলচ্চিত্রে ছোট্ট একটি অভিনয়ের জন্যে হলেও ডাক পাবার। তাঁরা জানে, অনিবার্য নিয়তির কথা, তবু অপেক্ষা করে। অভিনয়ের ঘোরে এক্সট্রা পরিচয়ে কাটিয়ে দেয় জীবন। শেলি ওয়ালিয়া বলেন, "প্রত্যেক জুনিয়র নারী অভিনেত্রীকেই বলিউডে বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয়। আমি দশ-বারো বছর যাবৎ ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি, এবং এটা ছিল সেসময় সবচেয়ে কঠিন।"[৬৯]

বলিউডে চল্লিশ বছর সহকারী অভিনয়শিল্পী হিসেবে কাজ করছেন এরকম একজন অভিনয়শিল্পীর মন্তব্য, "আমি ৬৯ বছর বয়সি একজন মানুষ এবং ১৯৬৩ সালে থেকে এই শিল্পে এসেছি। আমি 'গীতা গয়া পাথারো নে' চলচ্চিত্রে কাজ করেছি এবং এখন পর্যন্ত কাজ করছি। আমরা একটি বিশাল এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দলে কাজ করতাম এবং দুই থেকে পাঁচ শিফটে কাজ করে প্রতিদিন ৯০০ রুপি থেকে ১,০০০ রুপি আয় করতাম। বেশির ভাগ স্টুডিওতে আমরা কামরা পাই না, আমরা মাঠে

---

[৬৭] *প্রাগুক্ত*

[৬৮] *নিউজ১৮, 'বলিউড এক্সট্রা: স্টোরিজ অব ড্রিমস আনফুলফিল্ড,' নিউজ১৮, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2z9Sblu, *সর্বশেষ পঠিত: ৩ জানুয়ারি ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[৬৯] *শেলী, ওয়ালিয়া (২০১৪), 'দি ট্রু স্টোরি অব বলিউডস আন্ডারকভার ফিমেইল মেইকআপ আর্টিস্ট, কোয়ার্টাস ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2zGksMx, *সর্বশেষ পঠিত: ৫ মার্চ ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

বসে থেকে ডাকের জন্যে অপেক্ষা করি। কেবল করন জোহর এবং যশ চোপড়ার মতো বড় প্রডাকশন হাউস আমাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার ব্যবস্থা করে থাকে।"[৭০]

আলোচ্য বক্তব্যে অনুভূত হয়, সহকারী শিল্পীদের নিদারুণ জীবনচিত্র। চলচ্চিত্রে তাঁদের অবমাননা-অমর্যাদার চিত্র।

বলিউডে মূলত সহকারী বা জুনিয়র শিল্পীদের একটা বিশাল অংশ সিনেমায় গান এবং নাচের দৃশ্যে অভিনয় করেন। এই ভূমিকায় তাঁরাই যায় যাঁদের গ্ল্যামার রয়েছে। গ্ল্যামারনির্ভর চলচ্চিত্রে নির্দিষ্ট সময় শেষে নারী অপাঙক্তেয়। বেলাশেষে জীবনধারণ কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে ওঠে। জীবন সম্পর্কে প্রকাশিত কথায় তখন ব্যথার স্বর বেজে ওঠে। "আমাকে ৫০০০ টাকা বাসা ভাড়া দিয়ে থাকতে হয়। আমার হাতে অনেকদিন কোনো কাজ নেই। আমার ছেলেমেয়েরাও আমাকে দেখাশোনা করে না। এ জীবন সত্যি কঠিন।"[৭১] যদিও সিনিয়র-জুনিয়র সকল অভিনয়শিল্পীর জন্য সিনে অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টিস্ট এসোসিয়েশন নামে একটি ইউনিয়ন আছে, যারা সাধ্যমতো শিল্পীদের সাহায্য করে থাকে। তবে সকল শিল্পী সে সাহায্য পাওয়ার সৌভাগ্য নিয়ে আসে না। এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধেও জুনিয়র শিল্পীদের অভিযোগ রয়েছে, "ইউনিয়নের প্রচুর টাকা, আমি ১৯৬৪ সালে এসোসিয়েশনে যোগ দেই কিন্তু যে আশা ভরসা ছিল... আমরা জুনিয়র শিল্পীরা অবসরের পর রিটায়ার্ড ফান্ড থেকে কোনো সাহায্য পেলাম না। আসলে আমাদের জন্য কেউ না...।"[৭২]

নিজের অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করে বলিউডের জনৈক শিল্পী বলেন, "সবাই আমাদের নিয়ে মজা করে। কেউ এক্সট্রা থাকতে চায় না। সবাই চায় বিখ্যাত হতে। হয়ত পারে না। কিন্তু মনের তো একটা আশা থাকে। মেয়ে মানুষ না হয়ে পুরুষ মানুষ হলে হয়ত এত মজা করত না।"[৭৩] প্রকাশিত মন্তব্যে স্পষ্টই প্রতীয়মাণ যে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্র নারী-পুরুষের অবস্থান ভিন্ন। একজন সহকারী পুরুষ অভিনয়শিল্পী অভিনয় প্রসঙ্গে পরিবার ও সমাজ কর্তৃক যতটা সমর্থিত, নারী ততটাই অসমর্থিত। একজন সহকারী অভিনয়শিল্পী ঝা, তিনি বলেন, "আমি শুধুমাত্র অভিনেতাই নই, কাজ শেখা এবং বেঁচে থাকার জন্য আমি এখানে একজন পরিচালক এবং প্রডাকশনে একজন সহকারী হিসেবেও কাজ করি। প্রথম আমি 'শুবহ্ কদম' নামক সিরিয়ালে সহযোগী হিসেবে কাজ করি। পরবর্তী সময়ে গুজরাটি চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে কাজ করি। এটা আমার জন্যে খুব কঠিন ছিল না। কারণ আমি আমার পরিবার থেকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা পেয়েছিলাম।[৭৪]

অসংখ্য হতাশার মধ্যে ব্যতিক্রমী গল্প কখনো কখনো শ্রুত হয়। কলকাতা থেকে বলিউডে অভিনয় করতে আসা রীমা দেবনাথ বলেন, "যদি তোমার গডফাদার থাকে তবে অন্য কথা। তবে বেশির

---

[৭০] *নিউজ১৮, 'বলিউড এক্সট্রা স্টোরিজ অব ড্রিমস আনফুলফিল্ড,' নিউজ১৮, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2z9Sblu, *সর্বশেষ পঠিত: ৩ জানুয়ারি ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[৭১] *প্রাগুক্ত।*

[৭২] *প্রাগুক্ত*

[৭৩] *প্রাগুক্ত*

[৭৪] *প্রাগুক্ত*

ভাগ সময়ে, তুমি তোমার আপন প্রতিভায় জয়ী হবে।... আমি কলকাতায় থিয়েটার করছিলাম এবং মানুষ বলল 'তোমার হিন্দি সুন্দর, তোমার মুম্বাইতে চেষ্টা করা উচিত।' আমি নালিনী কলামঞ্চে ঢুকেছিলাম। আমি চারটা ভোজপুরি সিনেমা পেলাম। আমি একটা বিপিও জব পেয়েছিলাম এবং এটা আমাকে জীবনযাপনে সাহায্য করেছে।"[৭৫]

প্রসঙ্গত উপস্থাপন করা যায়, পরিবার-সমাজ-চলচ্চিত্র কর্তৃপক্ষ যদি মেধার মূল্যায়ন করেন তবে নারী-পুরুষ উভয়ই মেধার বিকাশ ঘটাতে পারেন। কিন্তু এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রথাগত মূল্যবোধ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতেই দেখা যায়।

সর্বোপরি একটি চলচ্চিত্রের কাহিনি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বলিউড ও ভারতের অন্যান্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সহকারী বা জুনিয়র নারী অভিনয়শিল্পীদের জীবনের চিত্র উপস্থাপন করা সম্ভব। পরিচালক মিলন লুথারিয়ার 'ডার্টি পিকচার' (২০১১) যেখানে পাওয়া যায়, একজন অতিরিক্ত নারী চলচ্চিত্রে আসা, টিকে থাকা ও শেষ পর্যন্ত ঝরে পড়ার এক গল্পের বর্ণনা। যে গল্পে রেশমা নামে একজন নারীর স্বপ্ন থাকে চলচ্চিত্রে অভিনয় করা। কাস্টিংয়ের জন্যে লাইন দিয়ে ক্লান্ত হয়। বারবার ফিরিয়ে দেয়, তবু আসে। হঠাৎ একটি নাচের দৃশ্যে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির জন্যে সে প্রযোজকের নজর কাড়ে। কিন্তু কেউ জানে না সেই মেয়ের কী নাম, কোথায় থাকে। শেষ পর্যন্ত রেশমাকে খুঁজে বের করে প্রযোজক। ধীরে ধীরে রেশমা হয়ে যায় সিল্ক। অশ্লীলতার জন্যে একটার পর একটা সিনেমা পায়, সিনেমা মুক্তি পায়, হিট হয়, নায়করা উপচে পড়ে যখন তখন, সিল্ক বস্তি থেকে ফ্ল্যাটে ওঠে, কিন্তু সিল্ক সিল্কই থাকে। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত চলচ্চিত্র ব্যবসার স্বার্থে সিল্ক ব্যবহৃত হলেও নায়িকা হিসেবে স্বীকৃতি সে পায় নি। সিল্কের মোহে অনেকে ছুটে গেলেও কেউ তাকে বিয়ে করে না। মিডিয়া সিল্কের বিপক্ষে চলে যায়, সিল্কের কাজ পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় এবং সর্বশেষ পরিণতি হয় মৃত্যু।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সহকারী নারী অভিনয়শিল্পী

"এই শিল্পীরা মূলত ব্যবহৃত হন অবয়বহীন বাণিজ্য-অনুষঙ্গ হিসেবে। চলচ্চিত্রের প্রান্তিক অস্তিত্ব তাঁরা। যেহেতু তাঁদের কোনো অবয়ব নেই, তাঁদের সম্পর্কে সমাজে কোনো ভাবনাও আছে বলে বোঝা যায় না। বাণিজ্যিক ধারার মুনাফা নিশ্চিত করার এক সামষ্টিক উপাদান বই অন্যকিছু কেউ তাঁদের সম্পর্কে ভাবেন বলেও আমার মনে হয় না। তাঁরা হলেন অস্তিত্বমান অনস্তিত্ব।"[৭৬]

বাস্তবিক পর্যবেক্ষণ ও তথ্যসূত্র থেকে যা উপলব্ধ হয় তাতে 'এক্সট্রা' বা সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীরা শিক্ষা, সম্পদ এবং সামাজিক প্রতিপত্তিতে অন্যান্য চরিত্রের অভিনয়শিল্পী এমনকি সমস্তরের পুরুষ অভিনয়শিল্পীর চেয়েও নিম্নে অবস্থানরত। চলচ্চিত্রে এই শিল্পীদের নির্মাণরূপ তাঁদের এক প্রান্তে নিক্ষেপ করেছে।

নানাস্তরের অভিনয়শিল্পীদের কার্যক্রমেরও পার্থক্য রয়েছে। সেদিক থেকে এই অভিনেত্রীরা বিভিন্ন

---

[৭৫] *বিটলি, ওয়েবসাইট:* http://ti.me/2zS38VRI, *সর্বশেষ পঠিত: ১০ এপ্রিল ২০১৭; অনুবাদ গবেষকের।*

[৭৬] *গায়েন, কাবেরী (২০১৭), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ১১ এপ্রিল ২০১৭।*

সময় ফ্রেমকে পরিপূর্ণ করতে কখনো বস্তির দৃশ্যে, কখনো শিক্ষাঙ্গণে, কখনো হাটবাজার, পারিবারিক অনুষ্ঠান, জন-জটলাসহ প্রভৃতি দৃশ্যে অভিনয় করেন। যাঁদের পর্দায় উপস্থিতির আকর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র, প্রয়োজনবিশেষে নেতিবাচক। বর্ণনাত্মক ছবিতে এই সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের মর্যাদার স্তর সবসময় অমর্যাদার বলে প্রতিভাত হয়। পরিবার থেকে প্রেক্ষাগৃহের সকল স্তরে পুরুষচক্ষুর বিনোদনে উদ্দিষ্টজন এঁরা। পুরুষ আধিপত্যশীল চলচ্চিত্রে অরক্ষিত এবং নিপীড়িত। চলচ্চিত্র বাণিজ্যের অনুষঙ্গ, তবু চলচ্চিত্রের মন্দা বাজারেও জীবন সংগ্রামে চলচ্চিত্রই তাদের চূড়ান্ত আশ্রয়।

উল্লেখ্য, অসম্মান, বঞ্চনা, অত্যাচার ও লাঞ্ছনার মধ্যে সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীরা জীবননির্বাহ করে। তাঁদের শিল্পী হিসেবে গ্রহণ করতে চায় না চলচ্চিত্র শিল্পের অধিকাংশ স্বীকৃত শিল্পীগণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যজন। যারা এক্সট্রা বা জুনিয়র বা সহকারী অভিনয়শিল্পীর ভূমিকায় চলচ্চিত্রে আসে তাঁদের ভাগ্যে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা এবং পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতার অদৃশ্য বলস্বরূপ এই স্তরের নারীরা শিল্পীর বদলে 'এক্সট্রা' হয়ে ওঠে। মজুরি বৈষম্য, নগণ্য মজুরি, কর্মসংকট, পেশা-চুক্তির অভাব, পরিচয় সংকট, পারিবারিক ভাঙন, সকল স্তরের উপেক্ষা, বিভিন্ন নিপীড়নে হতাশায়-রোগে-শোকে-পারিবারিক নিঃসঙ্গতায় নিরাপত্তাহীনতায় এবং বার্ধক্যের অক্ষমতায় এই শিল্পীরা প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকে পর্যবসিত হয়।

এ প্রসঙ্গে গবেষক শান্তনু সরকারের বক্তব্য উপস্থাপন প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, "আমরা যদি একটু গভীরভাবে পিতৃতন্ত্রের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করি তবে দেখব, তার পথ চলার মধ্যে অনেক স্থূল বিষয় যেমন আছে, তেমনি আছে অনেক সূক্ষ্ম কৌশলও। সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়েই পিতৃতন্ত্র নিজের ক্ষমতা অনুশীলন করার জন্যে নারীর উপর বলপ্রয়োগের পাশাপাশি নারীর প্রত্যয় উৎপাদনের চেষ্টাও করেছে সে প্রাক্-পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদ যে কোনো সমাজ ব্যবস্থাতেই।"[৭৭]

এই উক্তি সুস্পষ্ট করেছে বর্তমান সময়ে প্রান্তিকের চেয়েও প্রান্তিক এই সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা ভীষণভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। নারীর জীবন সংগ্রাম নিঠুর ও নিরন্তর। আর্থ-সামাজিক প্রতিপত্তি যে নারীর যত কম, তাঁর প্রতি নিপীড়ন তত বেশি মাত্রার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এ ক্ষেত্রে একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা যায়, চলচ্চিত্র-শিল্পে শ্রম প্রদান করা সত্ত্বেও এঁদের ভাগ্যে জোটে পুঞ্জীভূত অবজ্ঞা। ফলে এ শিল্পের বহু সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদালাভ করা এই নারীদের ভাগ্যে জোটে না। চলচ্চিত্র খাতের পুঁজি ব্যবসায়ী থেকে নির্মাতা ও অন্যান্য সকল স্তরের শিল্পী সুধীজন এই সহকারীদের উপস্থিতিকে তুচ্ছ মনে করে।

কিন্তু কাহিনিকে বাস্তবমুখীকরণে চলচ্চিত্রে তাঁদের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করতে পারেন না। এমনকি এই 'এক্সট্রা' শিল্পীদের উপস্থিতিতে অর্জিত ফল ভোগকরণেও কোনোরূপ দ্বিধা বোধ করেন না। বরং উপর্যুক্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই স্তরের নারীদের পর্দায় নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে

[৭৭] *উদ্বৃত, সরকার, শান্তনু (২০১১), 'একটি নারীবাদী পাঠ,' বাসবী চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, নারী পৃথিবী: বহুস্বর, কলকাতা: উর্বী প্রকাশন, পৃ. ৪১৬।*

থাকেন।

আবেদনময়ী উপস্থাপনের জন্যে নারীকেই বেছে নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে 'ভিজ্যুয়াল প্লেজার অ্যান্ড ন্যারেটিভ সিনেমা' নিবন্ধে লরা মালভী প্রদত্ত নারীকে দর্শনীয় করে ফুটিয়ে তোলার যে প্রথাগত প্রবণতা তার সুস্পষ্ট একটি ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "এই পৃথিবীতে পুরুষের চেহারা উজ্জ্বলতর এবং মেয়েদের চেহারা মলিন হিসেবে লিঙ্গবৈষম্য বিবেচনা করা হয়। সেজন্য আমাদের সমাজের চিরাচরিত ধারণা হচ্ছে, মেয়েদের অধিক সুন্দর করে সাজতে হবে, অধিক দর্শনীয় করে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। আমাদের সমাজের নারীদের যৌন উপাদান হিসেবে তুলে ধরা হয়। জেগফেল্ড থেকে বাসবি বার্কলে সকলেই পুরুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নিজেদের তুলে ধরেছেন। সামাজিক বর্ণনাত্মক ছবিতে মেয়েদের রূপসর্বস্ব অথবা নেতিবাচকভাবে প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি পুরুষকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরা।"[৭৮]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, পুঁজিপ্রধান বাস্তবতায় নারীর রূপদর্শন বাণিজ্যের বিশেষ উপাদান। যেখানে নারীর ইমেজ নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষশক্তি কর্তৃক পুরুষের দৃষ্টিনন্দনের জন্যে, সেখানে নায়িকা বা সহকারী নারী কারোরই নিস্তার নেই। তবে নায়িকার খ্যাতির কারণে ধর্ষণসহ বিভিন্ন আপত্তিকর দৃশ্যে উপস্থাপন করলে দর্শকের কাছে তাঁর সতীরূপটি কলুষিত হয়। এতে করে কখনো কখনো পরিচালকই ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই সংশ্লিষ্টজনদের ক্ষতি হ্রাস করতে গিয়ে সাধারণত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় 'এক্সট্রা' বা সহকারী নারী অভিনেত্রীটিকেই।

গবেষক আহমেদ আমিনুল ইসলাম বলেন, "উল্লেখের অবকাশ রাখে না, নারীর ইমেজ বা চিত্ররূপ পর্দায় প্রতিফলিত তার সকল কর্মকাণ্ড, অভিব্যক্তিময় দর্শন পর্যন্ত একটি নিয়ন্ত্রক শক্তি কর্তৃক আরোপিত, নিয়ন্ত্রিত এবং নির্ধারিতও বটে।"[৭৯]

সে ক্ষেত্রে আলোচ্য স্তরের নারীরা অধিক নিয়ন্ত্রিত। তাঁদের ঘিরে ঘুরপাক খাওয়া সামাজিক ধারণাগুলোও অধিক অবমাননাকর। ফলে নানাভাবেই নিপীড়নের শিকার হচ্ছে এই শিল্পীদের মন, শরীরসহ গোটা জীবনযাত্রা।

'দুঃসময় কাটছে না এক্সট্রা শিল্পীদের', শিরোনামে মাজিদ আলাউদ্দীন, বলেন, "একসময় রমরমা অবস্থা ছিল তাঁদের। এখন বেকার, নিঃস্ব। কেউ মঞ্চে উদ্দাম নৃত্য করছে। কেউ মিউজিক ভিডিওতে মডেল হচ্ছে। কেউবা অনৈতিক কাজে গা ভাসিয়েছে। অনেকেই এসবের সঙ্গে আপোস না করে উপোস অবস্থায় এফডিসিতে তীর্থের কাকের মতো কাজের অপেক্ষায় থাকে।"[৮০]

এ কথা অনস্বীকার্য, শিল্পের জন্যে যতই তাঁরা জীবনের মূল্যবান সময়টা ব্যয় করুক না কেন, সমাজ বারবার সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের এক প্রান্তের বলে নির্দেশ করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এই

---

[৭৮] Mulvey, Laura (১৯৯৯), "Visual Pleasure and Narrative Cinema," Leo Braudy and Marshal Cohen, eds., Film theory and criticism:) *Introductory Readings*, New York: Oxford University Press, pp. ৮৩৩-৪৪.

[৭৯] *ইসলাম, আহমেদ আমিনুল (২০১৪), বাংলাদেশের চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রে বাংলাদেশ, ঢাকা: ভাষাচিত্র, পৃ. ২২৮।*

[৮০] *আলাউদ্দীন, মাজিদ (২০১৬), 'দুঃসময় কাটছে না এক্সট্রা শিল্পীদের', বাংলাদেশ প্রতিদিন, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2iz7AEF, *সর্বশেষ পঠিত: ৩ জানুয়ারি ২০১৭।*

শিল্পীদের ভাগ্য অনেকটা বিনোদিনী দাসীর মতো। "১৮৭২ এ ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে এসেছিলেন বিনোদিনী দাসী বা নটী বিনোদিনী। থিয়েটারের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন বিনোদিনী, এমনকি নিজেকেও। অথচ থিয়েটারের গিরিশচন্দ্র ঘোষ এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়।"[৮১]

অন্ধকার স্তর থেকে উঠে আসা বিনোদিনীর অভিনয়শৈলীতে দর্শক মুগ্ধ হয়েছে। সেকালের থিয়েটার বিনোদিনীর জন্যে গৌরবান্বিত হয়েছে। বিনোদিনীর জন্যে থিয়েটার মঞ্চও পেয়েছে। কিন্তু থিয়েটারজনরাও তাকে বারাঙ্গনা বলে আঘাত করতে ছাড়ে নি। শেষ পর্যন্ত তিনি ১৮৮৭'র প্রথম রজনীর অভিনয় শেষে মঞ্চজীবনের ইতি টেনেছিলেন। বিনোদিনী তাঁর জীবনকথায় সেই বেদনার কথা লিখেছেন।

"নানা কারণের প্রধান কারণ যে আমায় অনেক রূপে প্রলোভিত করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া আমার সহিত যে সকল ছলনা করিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে বড় লাগিয়াছিল। থিয়েটার বড় ভালোবাসিতাম তাই কার্য্য করিতাম। কিন্তু ছলনার আঘাত ভুলিতে পারি নাই। তাই অবসর বুঝিয়া অবসর লইলাম।"[৮২]

রুপালি পর্দার অভ্যন্তরীণ জীবন প্রদর্শিত গল্পের মতো স্বচ্ছ-ঝলমলে-শত ঝঞ্ঝা শেষে সুখী সমাপ্তির মতো নয়। একজন সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীর জন্যে এখানে প্রতিটি মুহূর্ত যুদ্ধের। প্রতিটি মুহূর্ত স্বপ্নভঙ্গের। প্রতিটি মুহূর্ত অনিশ্চয়তার। খাদ্যের অনিশ্চয়তা, মজুরির অনিশ্চয়তা, সুরক্ষার অনিশ্চয়তা, সম্মানের অনিশ্চয়তা। সকল অনিশ্চয়তার মধ্যেই এই শিল্পীরা অভিনয়ের জন্যে অপেক্ষমান। পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসন, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতা, প্রবঞ্চনা এবং স্বার্থপরতায় এই অভিনেত্রীরা নানাবিদ নিপীড়নে দিনাতিপাত করেন।

মাঠের বয়ান

সহকারী নারী শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার লক্ষ্যে ৫০ জন সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীর সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়েছে, তাদের বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, চলচ্চিত্রে আগমন, আয়ের ধরন ও পরিমাণ, বিকল্প আয়ের উৎস আছে কি না, অভিনয়ের ক্ষেত্রে কোনো চুক্তি হয় কি না, অভিনয়শিল্পী হিসেবে পরিবার-সমাজ-চলচ্চিত্রে তাদের গ্রহণযোগ্যতা, চলচ্চিত্রের আসার পূর্বে কোনো সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল কি না, একজন নারী হিসেবে চলচ্চিত্রে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, অভিনয় ক্ষেত্রে শিল্পী সমিতি, জুনিয়র শিল্পী সমিতিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠনসমূহের ভূমিকা কী, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থা কেমন, ইত্যাদি। সংগৃহীত তথ্যের আলোকে ফলাফল ও বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা

---

[৮১] *মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনি (২০১৩), 'পঙ্কজা থেকে মহিয়সী,' নাট্যকথা, ওয়েবসাইট:* http://bit.ly/2ljcXca, *সর্বশেষ পঠিত: ৫ মার্চ ২০১৭।*

[৮২] *বিনোদিনী (২০১৪), 'আমার কথা: ষ্টার থিয়েটার সমন্ধে নানা কথা,' দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিনোদিনী রচনাসমগ্র, কলকাতা: পত্রভারতী, পৃ. ৮৫।*

হলো :

বয়স ভিত্তিতে উল্লিখিত সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে ৪৫ বছর বয়স দলে ছিলেন ১৪ জন (২৮%), ৪৫ থেকে ৬০ বছর বয়স দলে ৯ জন (১৮%), ৬০-এর ঊর্ধ্বে ৫ জন (১০%), ১৮-এর নিম্ন বয়স দলে ৪ জন (৮%)। প্রতীয়মান হয় যে, চলচ্চিত্রে ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের নারী সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারুণ্যের এই সময়টায় নারীদের চলচ্চিত্রে কর্মের সুযোগ বেশি। সকল বয়সের সহকারী শিল্পীরা এফডিসিতে এলেও চলচ্চিত্রে সম্পৃক্ততা কম।

পারিবারিক ভাঙনের শিকার : শিল্পীদের ১৯ জন (৩৮%) বিবাহিত, ১৪ জন (২৮%) অবিবাহিত, ১৪ (২৮%) জন আলাদা বা ভিন্ন থাকেন, ৩ জন (৬%) তালাকপ্রাপ্ত। তথ্য মতে, বিবাহিত ৩৮%-এর কেউ কেউ বিধবা। কারো স্বামীর একাধিক সংসার রয়েছে। স্বামীর দেখা কদাচিৎ মেলে। নাম মাত্র সম্পর্কে স্ত্রীর কোনো দায়িত্বই স্বামী পূরণ করেন না। তালাকপ্রাপ্তরা বিচ্ছিন্ন থাকেন বা পুনরায় বিয়ে করেন। তালাকসম্পন্ন নারীদের মধ্যে চলচ্চিত্র অঙ্গনে বিয়ে করার প্রবণতা রয়েছে। সেই সম্পর্কও প্রায়শ সাংঘর্ষিক। বিয়ের আগে প্রণয় থাকলেও অনেক স্বামী বিয়ের পরে স্ত্রীর চলচ্চিত্রে অভিনয়কে সহজে গ্রহণ করতে চান না। সারাদিন বাইরে থাকা বা আউটডোর কাজ কখনো স্বামী মেনে নিলেও শ্বশুরবাড়ির লোকজন গ্রহণ করেন না। ফলে সংসার ভেঙে যায়। অর্থ-গ্ন্যামার ঘাটতির কারণেও অনেক সংসার ভেঙে যায়। অনেকে নিজ থেকেই সংসার বর্জন করেন। ফলস্বরূপ, পারিবারিক ভাঙনে নারী যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হন তেমনি শিশুদের জীবনে অনিশ্চয়তার ছায়া নেমে আসে। নির্মাতা শামীম আখতার বলেন, "নারীদের এরকম একটা না, হাজারটা গল্প আছে। ওদের সন্তান কীভাবে মানুষ হচ্ছে? মায়ের এই অসুখী-ভঙ্গুর জীবন ওদেরকে কখনো ডিফেনসিভ বা ওফেনসিভ করে দিচ্ছে।"[৮৩]

চলচ্চিত্রে আসার কারণ : তথ্যমতে, নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন দেখে চলচ্চিত্রে আসেন ১৬ জন (৩২%), কাজের অভাবে আসেন ১১ জন (২২%), আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আসেন ১০ জন (২০%), প্রলোভনে পড়ে আসেন ৯ জন (১৮%), অভিনয়ের প্রতি অনুরাগ থেকে আসেন ০৪ জন (০৮%)। এ প্রসঙ্গে, সহকারী অভিনয়শিল্পী জেসমিন বলেন, "যে সময় সিনেমায় আসছি সে সময় সব ভালো ছিল। একটা কাজ শেষ করে দৌড়াতাম আরেকটা কাজের পিছনে। ভালোলাগা আছে তবে প্রয়োজনও ছিল।"[৮৪]

সহঃঅভিনেত্রী চন্দনা বলেন, " নায়িকা হইতে এসেছিলাম। হইতে পারি নাই। জুনিয়র শিল্পী হয়ে আছি।"[৮৫]

সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে শিক্ষার নিম্নহার : ২৩ জন (৪৬%) প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন, ১৬ জন (৩২%) নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত, ০৬ জন (১২%) মাধ্যমিক পর্যন্ত, ০৩ জন (০৬%) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত, ২ (০৪%) স্নাতক পর্যন্ত। স্নাতকোত্তর কাউকে পাওয়া যায় নি।

---

[৮৩] আখতার, শামীম (২০১৭), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ৩০ মার্চ ২০১৭।

[৮৪] আক্তার, জেসমিন (২০১৭), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৭।

[৮৫] চন্দনা (২০১৭), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ২২ জানুয়ারী ২০১৭।

লক্ষণীয়, সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের শিক্ষার ধাপ প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ। পর্যায়ক্রমে এ হার হ্রাস পেয়েছে। অভিনয়শিল্পী নদী খানম বলেন, লেখাপড়া নাই দেইখাই তো এক্সট্রা। তা না হলে সিনিয়র থাকতাম।"[৮৬]

চলচ্চিত্র সম্পর্কে একটি বিশেষ অংশের ধারণা রূপসর্বস্ব হলেই নায়িকা হওয়া যায়। নায়িকা হওয়ার ফ্যান্টাসিতে অনেকেই রূপসজ্জায় যতটা মনোনিবেশ করেন, লেখাপড়ায় ততটা মনোনিবেশ করে না। সাংসারিক অভাব অনটনেও অনেকে লেখাপড়া করতে পারেন না। অনেকের পরিবার মেয়েশিশুর শিক্ষাকে গুরুত্বই দেন না। নমুনা সংখ্যার শিক্ষা স্বল্পতার ক্ষেত্রেও এ ধরনের বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান।

চলচ্চিত্রে আসার পূর্বে সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততা : নমুনা সংখ্যার ৩৩ জন (৬৬%) শিল্পীর সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। বাকি ১৭ জন অভিনয়শিল্পীর মধ্যে ৫ জন (১০%) অভিনয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, ৮ জন (১৬%) নাচের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, ৪ জন (৮%) গানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, সহকারী অভিনয় অভিনেত্রীদের অর্ধাংশও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের নয়। ফলে এই শিল্পীরা নিজেরাও ভাবতে পারেন না কোথা থেকে, কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন। গবেষক কাবেরী গায়েন বলেন, "এসব অতিরিক্ত শিল্পীরা নামমাত্র সম্মানী পান। এর দুই অসুবিধা। প্রথম অসুবিধা হলো, এই নামমাত্র মূল্যের জন্যেই অনেককে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে অবাস্তব পোশাকে আর মেক-আপে দাঁড় করিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। দ্বিতীয় অসুবিধা হলো অভিনয় জানা শিল্পীদের এখানে পাওয়া যায় না।"[৮৭]

অধিকাংশ সহকারী বা জুনিয়র নারী অভিনয়শিল্পী চলচ্চিত্রে আসার পূর্বে শিল্পকলায় অভিজ্ঞতা আছে এমনটি বিরল। এই সুযোগটা গ্রহণ করে কারিগররা। নারীদের নামমাত্র মূল্যে অভিনয় করাতে চান পরিচালকগণ। শুধু নামমাত্র মূল্যই নয়, ইন্ডাস্ট্রি এই অভিনয়শিল্পীদের শিল্পী হিসেবে সম্মান করেন এমন প্রবণতা দেখা যায় না। সহকারী এই অভিনেত্রীরা সদাসর্বদাই অবহেলা ও হয়রানির শিকার হন। এই বঞ্চনার পাঁকে যে কয়জন শিল্পীমন নিয়ে আসেন, তাদের বোধও ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় এই তাচ্ছিল্যের স্রোতধারায়।

রক্ষণশীল সমাজ কাঠামোতে নারীরা অভিনয়ে আসছে এটা একদিকে যেমন ইতিবাচক, তেমনি এই হঠাৎ শিল্প পরিমণ্ডলে কারো কারো আগমন এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কারণ চলচ্চিত্রেও এমন কোনো তামিল দেওয়ার চর্চা নেই, যাতে করে তাদের মধ্যে শিল্পীবোধ জাগ্রত করা যায়। নারীদের এই না জানার সুযোগ কাজে লাগায় শিল্প-পুঁজি বণিকরা। আর সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীরা নিপীড়নের বলয়ে পড়ে মানবেতর জীবনযাপন করেন।

চলচ্চিত্রে সহকারী অভিনয়শিল্পী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির নীতিমালা : না, চলচ্চিত্রে সহকারী অভিনয়শিল্পী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে ৫৪%

[৮৬] খানম, নদী (২০১৭), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ২৩ জানুয়ারী ২০১৭।

[৮৭] গায়েন, কাবেরী (২০১৭), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ১১ এপ্রিল ২০১৭।

সহকারী অভিনয়শিল্পী, সরবরাহকারী মিডিয়ার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হন, ২৪% হন উৎপাদক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে, ৬% অন্যান্য সহকারী জুনিয়র অভিনয়শিল্পীদের সহযোগিতায়, ৬% নৃত্য পরিচালকের মাধ্যমে, ৪% নিজ উদ্যোগে, ৪% পরিচালক/প্রযোজকের মাধ্যমে এবং ২% অন্তর্ভুক্ত হন অন্যান্যের মাধ্যমে। চিত্র গ্রাহকের মাধ্যমে কোনো জুনিয়র শিল্পী অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায় নি। এ বিষয়ে সহকারী শিল্পী সমন্বয়কারী মিজানুর রহমান বলেন, "আমার সাথে প্রত্যেক জেলা উপজেলার লোকজনের যোগাযোগ আছে। তারাই আমার ঠিকানা দিয়ে দেয়। যারা সিনেমায় জুনিয়র হিসেবে কাজ করতে আসে তারা আমাকে খুঁজে নেয়। এই শিল্পীরা তখন আমার আন্ডারে চলে আসে। কেউ থাকে, কেউ কয়েকদিন থেকে চলে যায়। কারো পোষায়, কারো পোষায় না।"[৮৮]

চলচ্চিত্রে সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের বর্তমান কাজের অবস্থা : এই শিল্পীদের বর্তমান অবস্থা খুবই নাজুক। প্রাপ্ত তথ্যমতে, সহকারী বা জুনিয়র নারী অভিনয়শিল্পীদের ৮ জন (১৬%) নিয়মিত কাজ পান, ৩৬ জন (৭২%) নিয়মিত কাজ পান না, অবশিষ্ট ৬ জন (১২%) এ বিষয়ে কোনোরূপ মন্তব্য করেন নি। প্রবীণ সহকারী অভিনেত্রী বুলু বারী বলেন, "একটা সময় ছিল একই সাথে এফডিসিতে ১০ থেকে ১২টা সিনেমার সেট বানানো হতো। এক ফ্লোরে অভিনয় করে অন্য ফ্লোরে দৌড়াত জুনিয়র শিল্পীরা। ঝরনা স্পটে বুকিং পেত না পরিচালকরা। প্রতিদিন ৪/৫টি কাজ থাকতই। এখন আর ঝরনার ধারে জল রাখারও প্রয়োজন হয় না। খুবই খারাপ অবস্থা।"[৮৯]

সহকারী নারী অভিনয়শিল্পী মেরী আলোমতি বলেন, "প্রথম প্রথম কাজ পেলে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পেতাম। এখন তো কাজই নেই। থাকলেও ১০০ থেকে ৩০০ টাকা। বাংলামোটর এলাকায় একজনের সাথে থাকি। মাসে সিট ভাড়া দেই ১ হাজার টাকা। একা থাকলে বাসা ভাড়া দিতে হবে ১০০০০। সেই টাকা তো কামাই নাই। এখন কাজ পাওয়াই কঠিন। এখন তো প্রায়ই এক বেলা খেলে খাই, না খেলে নাই। একটি কাজের জন্যে হেঁটে আসি। ভাবি ফিরব আনন্দ নিয়ে, কিন্তু কাজ নাই! আসি! একটি চা-সমুচা খেয়ে দিন কাটিয়ে দেই।"[৯০]

সহকারী অভিনয়শিল্পীদের পারিশ্রমিক : সহকারী অভিনয়শিল্পীদের পারিশ্রমিক সাধারণত নির্ধারিত হয় দিন হিসেবে। ৩২ জন (৬৪%) শিল্পী অভিনয় করেন দিন হিসেবে, ১৮ জন (৩৬%) করেন শিফট হিসেবে। সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের শ্রমের মূল্য বর্তমানে দিন হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। শিফট হিসেবে অভিনয় করা সহকারী অভিনয়শিল্পীদের সংখ্যা স্বল্প। ঘণ্টা হিসেবে একজনকেও পাওয়া যায় নি। শিল্পীদের ঘণ্টা হিসেবে অভিনয় না করার চিত্র এই শ্রমের বাজার যে মন্দা তাকেই নির্দেশ করে। বর্তমান চলচ্চিত্রের মন্দাবাজারে অন্য কলাকুশলীদের ক্ষেত্রে শিফট ব্যবস্থা চালু থাকলেও সহকারী শিল্পীরা বর্তমানে শিফট হিসেবে কাজ পান না। ফলে সকাল থেকে রাত যে সময়ই শ্যুটিং প্যাক আপ হোক না কেন, দিন হিসেবেই পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী চিত্রও রয়েছে। যাঁরা সাধারণত নাচ বা আইটেম গানের দৃশ্যে অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিফট হিসেবে কাজ করেন। নির্দিষ্ট আয় থেকে আবার মিডিয়া বা জুনিয়র

[৮৮] রহমান, মিজান (২০১৬), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ১২ অক্টোবর ২০১৬।

[৮৯] বারী, বুলু (২০১৭), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

[৯০] আলোমতি, মেরী (২০১৬), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ১৪ অক্টোবর ২০১৬।

শিল্পী সমন্বয়ককে ভাগ দিতে হয়। একজন শিল্পীর সম্মানী হিসেবে এই আয় দারিদ্র্য সীমাকেই নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীর ৬ জন (১২%) দিন হিসেবে অভিনয় করে আয় করেন ১০০ থেকে ৩০০ টাকা, ৩১ জন (৬২%) আয় করেন ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা, ১১ জন (২২%) করেন ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা, মাত্র ২ জন (৪%) আয় করেন এর থেকে কিছু বেশি। এমনিতে জুনিয়র শিল্পীরা এক শিফটে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা, কেউ কেউ ১০০০ টাকাও উপার্জন করেন। ডাবল শিফটিং-এ তা দ্বিগুণ হয়ে যায়। তথ্য মেলে, নারী-পুরুষ জুনিয়রের আয় একই, তবে পুরুষদের এর বাইরেও কাজ আছে কিন্তু নারীদের নেই। যারা নাচ করেন তাদের আয়ের পরিমাণ কিছুটা বেশি হয়। তবে, প্রবীণ নারীদের অবস্থা নাজুক। বিশেষ করে একসময় যারা নাচতেন তাদের এখন কেউ না নেন নাচে, না নিতে চান অভিনয়ে। প্রবীণ সহকারী শিল্পী সিরাজুল ইসলাম বলেন, "বুড়িগুলো ২০০-৩০০ টাকা পায়। এই টাকা দিয়ে জীবন চলে?"[৯১]

বলা যায়, অভিনয়ের ধরন অনুয়ায়ী সহকারী শিল্পীরা ১০০ টাকা থেকে সর্ব্বোচ্চ ২০০০ টাকার মধ্যেই সাধারণত আয় করে থাকেন। বর্তমান চলচ্চিত্রের সংকটকালে কারো মাসে একটি কাজও জোটে না। পেলেও ১/২টার বেশি অসম্ভব। একজন সহকারী অভিনয়শিল্পীর আয় তাকে একটা দিনমজুরির চেয়ে নিম্নগামী অর্থনৈতিক অবস্থানে নিক্ষেপ করে।

অনিয়মতান্ত্রিক মজুরি ব্যবস্থা : প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সাধারণত নায়কের এককালীন পারিশ্রমিক আনুমানিক ৫-১০ লাখ টাকা, দৈনিক বা গড় আয় ১৩-২৫ হাজার টাকা। নায়িকার এককালীন পারিশ্রমিক ৩-৭ লাখ টাকা, দৈনিক বা গড় আয় ৮-১৬ হাজার টাকা। খলনায়কের এককালীন পারিশ্রমিক ২-৫ লাখ টাকা, দৈনিক বা গড় আয় ৬-১২ হাজার টাকা। খলনায়িকার এককালীন পারিশ্রমিক ১-৩ লাখ টাকা, দৈনিক বা গড় আয় ৫-১৫ হাজার টাকা। চরিত্র শিল্পীর এককালীন পারিশ্রমিক ১-৩ লাখ টাকা, দৈনিক বা গড় আয় ৩-১০ হাজার টাকা। সহকারী বা জুনিয়র বা এক্সট্রা শিল্পীদের এককালীন হিসেবে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়, যাদের দৈনিক বা গড় আয় ১০০ থেকে ২ হাজার টাকা মাত্র। ক্রমানুসারে সর্বনিম্ন পারিশ্রমিক হলো সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের। নগণ্য মজুরি হার এই শিল্পীদের দিনমজুরের চেয়ে নিম্নমানের জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দেয়।

উল্লেখ, কোনো নির্দিষ্ট সিনেমা ধরে চরিত্র মোতাবেক পারিশ্রমিকের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। নির্মাতাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে তারা তথ্য প্রদান করতে সম্মত হন নি। ফলে সম্ভাব্য ন্যূনতম ও সর্বাধিক পারিশ্রমিক প্রদানের একটিমাত্র চিত্র পাওয়া যায়। চলচ্চিত্রের বাজেট অনুযায়ী, এই পারিশ্রমিকেও তারতম্য ঘটে বলে নির্মাতারা মত প্রকাশ করেন।

অভিনয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া : পেশাগত চুক্তির অভাব একটি বৃহৎ বাধা। তথ্যানুযায়ী, সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের ৫০ জনেরই (১০০%) অভিনয়ে অন্তর্ভুক্তির আগে কোনো চুক্তিপত্র হয় নি। বলা যায়, বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রে সহকারী অভিনয়শিল্পীদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটি কোনো

[৯১] ইসলাম, সিরাজুল (২০১৭), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ৮ মার্চ ২০১৭।

পেশাগত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নয়।

কেন্দ্রীয় অভিনয়শিল্পীসহ যন্ত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী প্রধানের সাথে চুক্তিপত্র করা হলেও সহকারী বা জুনিয়র শিল্পীদের সাথে কোনো চুক্তিপত্র হয় না। সাধারণত, পেশাগত চুক্তির অভাব অর্থাৎ নিয়োগ প্রক্রিয়া যখন কোনো নিয়ম মেনে হয় না, তখন শ্রম ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের নানা অনিয়ম করার সুযোগ থাকে। আর শ্রম বিক্রেতার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা তো থাকেই। মজুরির অনিয়ম চুক্তির ওই ঘাটতি থেকে আরো জোরদার হয়।

বিকল্প আয়ের পরিস্থিতি : শিল্পীদের বিকল্প আয় প্রায় নেই বললেই। অভিনয় ব্যতীত বিকল্প আয়ের উৎস আছে মাত্র ১৩ জন (২৬%) সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীর, ২৬ জন (৫২%) অভিনয়শিল্পীর বিকল্প আয়ের কোনো উৎস নেই। আর ১১ জন (২২%) এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেন নি। তথ্যানুসারে, অভিনয়ের উপর নির্ভর করেই সহকারী অভিনেত্রীদের জীবন পরিচালিত হয়। বিকল্প কোনো আয়ের উৎস তাদের নেই। বাংলাদেশী চলচ্চিত্রের একটি সময়ে অভিনয়কে আশ্রয় করে জীবনধারণে কোনো সমস্যা হয় নি। ফলে বিকল্প কোনো কাজ করার মানসিকতা প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে তৈরি হয় নি। পরবর্তী সময়ে যারা এই শিল্পে এসেছেন তাদের অনেকে পরিস্থিতি বুঝে বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে নিয়েছেন। অনেকে পারেন নি।

পরিবারের ভরণপোষণ : অধিকাংশ শিল্পীর পরিবারই তাদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। ৩৯ জন (৭৮%) শিল্পীর আয়ের ওপর তাদের পরিবার নির্ভরশীল। ৩ জন (৬%) জানান, তাদের আয়ের উপর নির্ভর করে তাদের পরিবার পরিচালিত হয় না। আর ৮ জন (১৬%) নারী এ বিষয়ে কোনো মতামত প্রদান করেন নি। সহকারী অভিনেত্রীদের বৃহদাংশ পরিবারের অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব পালন করেন। নবীনদের অনেকে লেখাপড়া করছেন, পরিবারে তাদের অভিভাবক রয়েছেন। তবে সে সংখ্যা অপ্রতুল। সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী শিল্পীই পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস। চিরকাল সংসারের সকল দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেছেন এবং আজো তাই করে চলেছেন। বৃদ্ধ বয়সেও একটি কাজের জন্যে এফডিসি আঙিনায় বসে থাকছেন। কম সংখ্যক প্রবীণ অভিনেত্রীই রয়েছেন, যাদের উপার্জনক্ষম ছেলে-মেয়ে থাকা সত্ত্বেও তিনবেলা ভাত জুটাতে দুঃশ্চিন্তা করবার প্রয়োজন হয় না।

পরিবারের সমর্থন : অধিকাংশ নারী অভিনয়শিল্পীর অভিনয়েই পারিবারিক সমর্থন নেই। তথ্যমতে, ১৫ জন (৩০%) নারীর অভিনয়ের কথা পরিবার জানে, ১৭ জন (৩৪%) নারীর অভিনয়ের কথা জানে না। আর ১৮ জন (৩৬%) নারী এ ব্যাপারে মন্তব্যহীন থেকেছেন। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারী আজো চলচ্চিত্রে অভিনয়ের কথা পরিবারে বলতে পারে না। 'অভিনয়ে নামা' প্রত্যয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে চায় অভিনয় মানে খারাপ হয়ে যাওয়া বা নিচে নেমে যাওয়া বা অধঃপাতে যাওয়া বা এমন কিছু একটা। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করে পরিবার সদস্যদের অন্য যে কর্মকাণ্ডেই যেতে দিক অন্তত অভিনয়ে যেন নামতে না দেয়। সে কারণেই অনেকে ভিন্ন চাকরির অজুহাতে লুকিয়ে অভিনয় করে যান। পরিবার যখন জানতে পারে, তখন পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হয়। কেউ মেনে নেন, কেউ মেনে নিতে পারেন না। এমনকি যে সন্তানের লালন-পালনের জন্যে নারী অভিনয় করেছেন, সেই সন্তানও বড় হয়ে মায়ের অভিনয়কে সমর্থন করতে চান না।

চলচ্চিত্র অঙ্গনে মর্যাদা প্রাপ্তি : সাক্ষাৎকারে ৭ জন (১৪%) নারী অভিনয়শিল্পী চলচ্চিত্র অঙ্গনে শিল্পী হিসেবে মর্যাদা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলেছেন। ৩৭ জন (৭৪%) শিল্পী হিসেবে সম্মান পান না। আর কোনোরূপ মন্তব্য করেন নি ৬ জন (১২%)। প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারীর চলচ্চিত্র অঙ্গনে কাজ করাই কঠিন। একজন নারী অভিনয়শিল্পীর প্রতি সমাজের আঙুল সর্বদাই তির্যক। চলচ্চিত্রে সহকারী শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেন এমন কোনো নারীকে সমাজ বাসা ভাড়া পর্যন্ত দিতে চায় না।

চলচ্চিত্র বিষয়ক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা : চলচ্চিত্র বিষয়ক সংগঠনের সাথে নমুনাভুক্তদের সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায় না। চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সদস্য মাত্র ৩ জন (৬%), ৪৭ জন (৯৪%) শিল্পী সমিতির সদস্যপদ লাভ করতে পারেন নি। জুনিয়র শিল্পী সমিতির সদস্য ১৪ জন (২৮%) নারী। বাকি ৩৬ জন (৭২%) সমিতির সদস্য নন। তথ্যমতে, সহকারী অভিনয়শিল্পীরা শিল্পী সমিতিতে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত। শিল্পী সমিতি সহঃশিল্পীদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে অনাগ্রহী। সংগঠনে সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে মরিয়ম আক্তার বলেন, "শিল্পী সমিতিতে আমাদের জায়গা নেই। শিল্পী সমিতিতে ২৫,০০০ টাকা দিতে পারলে শিল্পীও হতে হবে না, এমনিতেই সদস্য হয়ে যেতে পারবেন। আমাদের এত টাকা কই? আর টাকা হইলেই কী? সম্মান নাই। শিল্পী সমিতি যদি শিল্পীদের উন্নতি করত তবে শিল্পীরা রাস্তায় পইরা মরত না। শিল্পী সমিতি মৃত্যুর পর বোর্ডে নাম লিখবে আর দোয়া পরাইয়া জিলাপি খাওয়াইয়া দিবে।"[৯২]

কর্মক্ষেত্রে বাধা : অধিকাংশ নারী সহকারী অভিনয়শিল্পীকেই কর্মক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। নারী হিসেবে বাধার সম্মুখীন হন বলে ৩৭ জন (৭৪%) অভিনেত্রী স্বীকার করেছেন। মাত্র ২ জন (৪%) কোনো বাধার সম্মুখীন হন না বলে জানান। ১১ জন (২২%) এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেন নি। লক্ষণীয় যে, মজুরি-সুরক্ষা-মর্যাদা-অভিনয় ক্ষেত্র-সংগঠন কোনো পর্যায়েই এই অভিনেত্রীদের অবস্থান অনুকূল নয়। অসংখ্য প্রাণ একটা ধোঁয়াশাপূর্ণ জীবন ব্যবস্থায় দিন পাড়ি দিয়ে দিচ্ছেন, যারা অভিনয়শিল্পী হতে চান কিন্তু হতে পারছেন না। তারা অভিনয় করলেও অভিনয়শিল্পী হিসেবে মর্যাদা পাচ্ছেন না। কখনো কখনো তাদের শিল্পী বলা হলেও সংশ্লিষ্ট সংগঠনে স্বীকৃতি মিলছে না।

কর্মক্ষেত্রে নিপীড়ন : তথ্যমতে, সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে ৩১ জন (৬২%) কর্মক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক হয়রানির শিকার হয়েছেন, ৭ জন (১৪%) কোনোরূপ হয়রানির শিকার হন নি, ১২ জন (২৪%) শারীরিক ও মানসিক হয়রানির প্রসঙ্গে নীরব থেকেছেন। বাণিজ্যিক লাভের আশায় যে ধরনের পোশাক ও সজ্জায় একজন নারীকে উপস্থাপন করা হয়, অধিকাংশ সহকারী অভিনেত্রীই তা পছন্দ করেন না। মানসিকভাবে সে হয়রানির শিকার হলেও আয়ের আশায় মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা যায়, চলচ্চিত্রের কর্মপরিবেশ সমাজের অন্য সব স্তরের মতোই নারীর জন্য অনুকূল নয়। বিভিন্ন কলাকুশলী, বাইরের বন্ধুবান্ধব অর্থাৎ ঘরে-বাইরে সর্বস্থানেই একজন নারী অভিনয়শিল্পীকে হয়রানির শিকার হতে হয়।

[৯২] আক্তার, মরিয়ম (ছদ্মনাম), বর্তমান গবেষণার জন্যে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ২৩ জানুয়ারি ২০১৭।

চলচ্চিত্র শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সন্তুষ্টি : বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রে অভিনয়ের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সন্তোষজনক মত ব্যক্ত করেছেন মাত্র ৪ জন (৮%), সন্তোষজনক নয় বলেছেন ৪৩ জন (৮৬%)। আর কোনোরূপ অভিমত প্রদান করেন নি ৩ জন (৬%)। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায়, বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্র সম্পর্কে অসন্তুষ্ট সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীর সংখ্যাই বেশি। এ থেকে চলচ্চিত্রের মন্দা পরিস্থিতির চিত্রই ফুটে ওঠে। চলচ্চিত্রের মন্দা বাজার, তাদের কাজে মধ্যস্বত্বভোগী বা সরবরাহকারীর দৌরাত্ম্য, পর্দায় তাদের উপস্থাপনের ধরন সংশ্লিষ্ট এই শিল্পীদের অসন্তোষের কারণ।

বয়ানসূত্রে উন্মোচিত হয়েছে, চলচ্চিত্রে সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীদের কাজের সংকট বাড়াচ্ছে বেকারত্ব, শিল্পীরা জড়িয়ে যাচ্ছেন অনৈতিক কাজে, চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় সহকারী অভিনয়শিল্পীরা মনোযোগ পান না, চলচ্চিত্রে তারা বিভিন্নভাবে সহিংসতা ও প্রতারণার শিকার। অথচ যথার্থ উদ্যোগ নেওয়া হলে তারা হয়ে উঠতে পারেন সম্ভাবনাময়।

সমস্যা নিরসন সূত্র

> সিনেমাকে যতই নিন্দামন্দ করা হোক না কেন, সিনেমার রয়েছে যে নিজস্ব দর্শন-সুখ, তার মাধ্যমেই সিনেমা বাঁচিয়ে রাখে নিজের অস্তিত্ব।[৯৩]

এই ভূখণ্ডের সিনে-শিল্পে লালবাতি জ্বলেছে, বড় বেশি যৌন-উত্তেজক, নারীর উপস্থাপন এতই সহিংস যে পরিবার নিয়ে দেখা যায় না, থিয়েটার-নাটকে ভালো মেয়েরা গেলেও চলচ্চিত্রের মেয়েরা কখনোই ভালো হয় না, মূলধারার বাংলা সিনেমা ছোটলোকে দেখে, এই সিনেমার নির্মাণ নিয়ে বিদেশি আড্ডায় গল্প করা যায় না, মূলধারার সিনেমা যে বানায় সে একটা সৃজনহীন মানুষ, সিনেমায় যে নারীরা অভিনয় করে তাদের ঘর-সংসার-চরিত্র কোনোটাই নেই– এইরূপ শত বিশেষণে বিশেষায়িত হওয়ার পরও সত্য এই যে গণমাধ্যম হিসেবে সিনেমার দর্শন-সুখের বিকল্প মাধ্যম এখনো উদ্ভাবিত হয় নি। তবে, অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এই দর্শনে সুখের পাশাপাশি অভিমানও রয়েছে। সুখ আর অভিমানের দ্বন্দ্বে সিনেমার অস্তিত্ব বিলীন না হলেও মরিমরি দশা।

এই মরিমরি দশায় দর্শক যখন বাংলাদেশের সিনে-পর্দা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, নায়ক-নায়িকা নিজেদের সাফল্যে কলকাতা সিনে-ইন্ডাস্ট্রির দিকে ধাবমান, প্রযোজক অনাগ্রহী, পরিচালক বিকল্প ব্যবসা আর সিনেমা পাশাপাশি করছে তখন সহকারী/জুনিয়র/এক্সট্রা নারী অভিনয়শিল্পীরা অধীর আগ্রহে বসে থাকছে একটি শটের জন্যে। অভাব-অজ্ঞতা-অভিনয় অনুরাগ যে কারণেই হোক তারা এফডিসি আঁকড়ে পড়ে আছে। এই নারীরা রাতারাতি নায়িকা না হতে পারে, দীর্ঘ বছরেও কোনো বিশেষ চরিত্রে অভিনয় না করতে পারে কিন্তু এই নারী অভিনয়শিল্পীদের চলচ্চিত্র উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারলে তারা চলচ্চিত্রের শক্তি হয়ে উঠতে পারেন।

---

[৯৩] নাসরীন, গীতি আরা ও হক, ফাহমিদুল (২০০৮), *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প, সংকটে জনসংস্কৃতি*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশণী, পৃষ্ঠা ১৫৯।

গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের আলোকে, সহকারী বা জুনিয়র বা এক্সট্রা নারী অভিনয়শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক সংকট উত্তরণের জন্যে করণীয় নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের চেষ্টায় কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করব, যা এই শিল্পীদের সংকট কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি চলচ্চিত্রের জন্যে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। এজন্য এক্সট্রা নয় শিল্পী হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার মানসিকতা পোষণ করতে হবে; সকল সহকারী শিল্পীকে সংগঠিত করে ইউনিয়নভুক্ত করতে হবে; এক্সট্রা নয়, অভিনয়শিল্পী হিসেবে বাছাই প্রক্রিয়ায় পেশাদারিত্ব আনতে হবে। এ ছাড়া, চলচ্চিত্র নির্মাণ বৃদ্ধিকরণ এবং বৃহত্তর বাজারের সন্ধান; এক্সট্রা বা জুনিয়র নয়, শিল্পী পরিচয়ে তাদের শিল্পী সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করা; সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান এবং সকল ধরনের নিপীড়ন রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি রাষ্ট্র/সরকারকে সহকারী নারী অভিনয়শিল্পীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নিরাপত্তা বিমার ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিল্পীর সম্ভাবনাকে জিইয়ে রাখার উদ্যোগ নিতে হবে।

জয়শ্রী সরকার গবেষক, কথাসাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মী এবং কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, সামাজিক ক্ষমতায়ন ও আইনি সুরক্ষা কর্মসূচি, ব্র্যাক। joyshri.bithi@gmail.com